প্রণয়পাশা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭৩

প্রথম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ২৯

মুদ্রাকর
ধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা ৯

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ঘরে একাই ছিল
আবার আমি আসব
রূপের হাটে বিকিকিনি
মন মধুচন্দ্রিকা
আমি সে ও সখা
বলাকার মন
সেই আমি সেই তুমি
নগর পারে রূপনগর
যার যেথা ঘর
কাল, তুমি আলেয়া
শিলাপটে লেখা
সাত পাকে বাঁধা
জানালার ধারে
পরিণয়মঙ্গল
রাত্রির ডাক
প্রতিহারিণী
নগ শৃঙ্গার
ঝংকার
সোনার কাঠি রূপোর কাঠি
কুমারী মাতা
[illegible]নার শেষ ঠিকানা

নতুন তুলির টান
হিসাব মেলাতে

সমুদ্র সফেন
ডাকতে জানলে
আলোর ঠিকানা
বাধাচূড়ার বাঁশী
অপরিচিতের মুখ
চলো, জঙ্গলে যাই
একজন মিসেস নন্দী
বাজীকর
পঞ্চতপা
চলাচল
বকুল বাসর
স্বয়ংবৃতা
বিদেশিনী
অন্য নাম জীবন
সাঁঝের মল্লিকা
নিষিদ্ধ বই
শ্রেষ্ঠ গল্প
হৃদয়ের পথে খুঁজো
স্বনির্বাচিত
ফয়সলা
আবার কর্ণফুলি আবার সমুদ্র

প্রণয়পাশা

অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে খুশী মুখে ডক্টর কেলার মাথা ঝাঁকাল। চোখের কোল দুটো একবার টেনে দেখতে দেখতে মৃদু মিষ্টি অনুযোগের সুরে বলল, ইউ নটি বয়, সকলকে ভাবিয়ে তুলেছিলে।

সারার দিকে তাকালো। ঠোঁটে তেমনি মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে অভয় দিল। ঠাট্টার সুরে বলল, সব ঠিক আছে, বাঘ-সিংহ ঘাঁটা মেয়েও এমন ঘাবড়ে যায়—তাজ্জব ব্যাপার।

ওর কাঁধ চাপড়ে দিল একটু। ওই ট্রিট্‌মেণ্ট চলবে, তোমার কালো ভূত তিনদিনের মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠবে, অ্যাণ্ড উইল বি এ মাংকি এগেন—সো নো ওয়ারি।

আর এক দফা ওর পিঠ চাপড়ে দরজার দিকে এগুলো। চার ভাগের তিনভাগ নিশ্চিন্ত হয়ে আর একভাগ সংশয় নিয়ে সারা তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমি জানি বাইরে গিয়ে ও আবার তার হাত ধরবে, অনুযোগের সুরে সত্যি কথা বলতে বলবে, আরো নিশ্চিন্ত হতে চাইবে।

ডক্টর কেলারের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। এখনো সুপুরুষ। চল্লিশ বছরের মতো ব্যস্ত-সমস্ত চাল-চলন। এ-তল্লাটে সব থেকে নামী ডাক্তার আর রোগীমাত্রেরই সব থেকে প্রিয় ডাক্তার। রসিক মানুষ। সঙ্কটজনক অবস্থাতেও রোগীর অবস্থা ফেরানোর জন্য মিষ্টি মিষ্টি হাসতে পারে, দরকারে দুই একটা রসিকতার কথাও বলতে পারে। সেই কারণেই আবার সারার সংশয়—যা বলল ঠিক বলল কি না কে জানে। সবার বিশ্বাস, চিকিৎসক হিসেবে তার বাপের বন্ধু এই মানুষটি ধন্বন্তরি বটে, কিন্তু দরকার হলে সত্যের সঙ্গে অম্লানবদনে অনেক মিথ্যেও মেশাতে পারে।

ঘণ্টা দুয়েক আগে ডক্টর কেলার এই ঘরে যখন এসেছিল, এই বিছানায় তখন আমি ভোঁদড়ের মতোই ওলট-পালট খাচ্ছি। অসহ্য যন্ত্রণায় ঘেমে নেয়ে উঠছি। সারা তখন ওর কি একটু মার্কেটিং সারতে

গেছল। ওকে ডাকার জন্য আমি বোমারকে পাঠাতে পারতাম। বোমার কাছেই কোথাও ছিল নিশ্চয়। ওকে বললে ও তক্ষুনি ডক্টর কেলারকে টেলিফোনে খবর দিয়ে সারাকে যেমন করে হোক ধরে আনত। বোমারের বোধহয় ষষ্ঠ স্নায়ু বলে কিছু আছে—ঠিক দরকারের জায়গাটিতে আঙুল ফেলতে পারে।

যাক, আমি টেবিলের টাইপ-রাইটারে বসে কয়েকটা দরকারী চিঠি টাইপ করছিলাম। চিন চিন-এ যন্ত্রণাটা বাড়তে থাকল। সকাল থেকেই একটু একটু টের পাচ্ছিলাম। সারাকে কিছু বলিনি। শুনলেই ভয়ে সিঁটিয়ে ও তিলকে তাল বানাবে, জামার কলার ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে আমাকে বিছানায় এনে শোয়াবে। তারপর ছোটাছুটি চেঁচামেচি শুরু করে দেবে।

যন্ত্রণাটা ক্রমে অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে লাগল। কিছু দিনের পুরনো ডিওডন্যাল আলসার। ডক্টর কেলারের ধারণা, খাওয়ার অনিয়ম করে আর খালি পেটে মদ গিলে আমি এই সম্পদটি সংগ্রহ করেছি। তার ধারণার কথা শুনে সারার সেটাই বদ্ধমূল বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অবশ্য সে-জন্য আমাকে বকাবকি ছেড়ে একটা অনুযোগও করে না। ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ফেলে, আর কোনো সময় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে, তোমাকে আর কি বলব, সব দোষ তো আমার।

ব্যথা বাড়তেই থাকল। টাইপ এগলো না, টেবিল ছেড়ে উঠতে হল। ঘরে কিছু ওষুধ মজুত থাকে তাই খেলাম। যন্ত্রণাটা এবার বুকের দিকে উঠতে লাগল। তবু বোমারকে ডাকলুম না। তার এক কারণ, আমার সহ্যশক্তি অপরিসীম। যত দোষই থাক আমার, এ-যাবৎ সহিষ্ণুতা নিয়ে খোঁটা কেউ দেয়নি। হ্যাঁ, শারীরিক যাতনা অন্তত আমি অনেক সহ্য করতে পারি। এখন সারাও তা জানে। জানে বলেই আমাকে ভয় আর অবিশ্বাস ওর। ভাবে, চোখ একেবারে উল্টে দেবার আগেও বুঝি আমি ভালোমানুষের মতো মটকা মেরে পড়ে থাকতে পারি।

বোমারকে না ডাকার আসল কারণ ভিন্ন। ও টের পেলেই সারা

জানবে। তারপর ওর সেবা-যত্নের অত্যাচারে বেচারা আমি অস্থির হয়ে পড়ব। সব থেকে বেশি মুশকিল হবে পথ্য নিয়ে। এক্সরে-ফেক্সরে করে ডাক্তার আলসার ঘোষণা করার পর থেকে এমনিতেই যা পথ্য আমার, দেখলে চোখে জল আসে। কেবল দুধ খাও আর দুধ খাও, আর সেদ্ধ খাও আর সেদ্ধ খাও। আবার যন্ত্রণার কথা জানতে পারলেই এখন টুকিটাকি যা একটু খেতে পাচ্ছি তা তো বন্ধ হবেই, সেদ্ধও বন্ধ হয়ে যাবে। সেবেলায় সারা অকরুণ। অসুখটা হবার পর থেকে অনিয়ম বিশেষ করি না, তবু ওর অগোচরে ফাঁক পেলে লোভে পড়ে একটু-আধটু অনিয়ম করে ফেলি। দুই-একবার ধরা পড়ার ফলে এখন আর আমি একটুও বিশ্বাসের পাত্র না। একটু এদিক-ওদিক হলেই ভুরু কুঁচকে শাসাবে, কোথায় কি খেয়েছিলে?

ডক্টর কেলার বলেছিল, অপারেশন করে ফেলা যেতে পারে। অবশ্য নিয়মে থাকলে আর ওষুধপত্র ঠিক মতো চললে এ যা হয়েছে অমনিতেই সেরে যাবে। শেষের রাস্তাটাই আঁকড়ে ধরেছে সারা। অপারেশনে তার যেমন ভয় তেমনি আপত্তি। এমন কি পারতপক্ষে সে আমাকে হাসপাতালেও পাঠাবে না। বাড়িতে ডাক্তার ডাকবে, ডবল খরচা করে হাসপাতালের মতো ব্যবস্থা করবে। ওর ভয়, হাসপাতালে পাঠালেই সার্জন ছুরিতে শান দিতে থাকবে। ভয়ের কারণ আছে। ছেলেবেলায় ওর এক কাকা এই রোগের অপারেশন করাতে গিয়ে মারা গেছল। নিজের বাবাকে তো দুচক্ষে দেখতে পারত না। সেই কাকাকে বাবার মতো ভালবাসত। কাকা মারা যাবার পর শুনেছে ডাক্তারদের কি ভুলের ফলে অমন অঘটন ঘটেছে। বাস, সেই থেকেই হাসপাতাল আর অপারেশন সম্পর্কে বিভীষিকা।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কি-যে হয়ে গেল জানি না। যন্ত্রণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। মনে হচ্ছে বুকের ভিতরটা কেউ যেন পাথর দিয়ে ছেঁচছে। দর দর করে ঘাম হচ্ছে। টেলিফোন ইচ্ছে করেই শোবার ঘরে রাখি না। উঠে পাশের ঘরে যাবার শক্তি নেই। দুই একবার চেষ্টা করতে গিয়ে যাওয়া। ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে যাবার দাখিল। বার-

কয়েক বোমারকে ডেকে সাড়া পেলাম না। পাশের ঘরে নেই, তার ঘর ফ্ল্যাটের শেষ মাথায়।

বালিশ পেটে চেপে আমি যখন উথাল-পাথাল করছি, কয়েকটা প্যাকেট বুকে চেপে সারা ঘরে ঢুকল। হতভম্ব প্রথম। বিছানায় বসে আমি কিছু সার্কাসের কসরত দেখাচ্ছি কি না ভাবল বোধহয়। বালিশ বুকে চেপে আর উবুড় হয়ে আমি ওর দিকে চেয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করলাম। হাসি ফুটল কি না জানি না।

—ও গড্! অস্ফুট আর্তনাদ। হাতের প্যাকেটগুলো মাটিতে পড়ে গেল। ছুটে এসে দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার মুখটা তুলে অস্থির সঙ্কটে ঠোঁটে মুখে গাল ঘষে ঘষে যন্ত্রণা মুছে দিতে চেষ্টা করল। —ও ডার্লিং, ডার্লিং।

তারপরেই সংবিৎ ফিরল যেন। গলা ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল। পায়ের ধাক্কায় একটা প্যাকেট দূরে ছিটকলো। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তেমনি ত্রাসে ছুটে এলো আবার। তার পিছনে কাঁচা-পাকা চুল বোমার। আমার অনেক দুঃখ আর অনেক সুখের সাথী ফ্র্যাংকি বোমার। ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে আমি জীবনের তাপ অনুভব করলাম, যন্ত্রণার উপশম হচ্ছে ভাবতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু যন্ত্রণা সত্যিই বাড়ছে বই কমছে না।

সারা আবার এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। বিছানায় শুইয়ে দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু শুলে আরো বেশি কষ্ট হয়। বোমারের উপস্থিত-বুদ্ধির বরাবরই তুলনা নেই। তার মুখের কথা থেকে হাত দুটো অনেক বেশি তৎপর। তাড়াতাড়ি গোটাকতক বালিশ এনে জড় করল। তার-পর আমাকে টেনে বসার মতো করে শুইয়ে দিল। তারপরেই জলের গেলাস মুখের সামনে ধরল।

জল খেয়ে আর উঁচু বালিশে মাথা রেখে একটু যেন আরাম পেলাম। মিনিট পাঁচেক মাত্র, তারপর আবার সেই বুক-ভাঙা যন্ত্রণা। সারা দিশেহারার মতো আমাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরছে, বুকে হাত বুলিয়ে

সব যন্ত্রণা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছে, আর থেকে থেকে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠছে, ও গড্ ও গড্…ও ডার্লিং ডার্লিং…

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। বোমারের দিকে ফিরে কান্না-ভরা বিকৃত গলায় বলে উঠল. দেখছ কি, আমার পাপের শাস্তি, আমার পাপের শাস্তি, কিন্তু তুমি তো বন্ধু—ডাক্তার আসছে না দেখেও দাঁড়িয়ে আছ কেন? হাসপাতালে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বলছ না কেন? আর কতক্ষণ দেখবে—এটা হার্টের ব্যাপার কিছু, বুঝতে পারছ না?

বোমার বলল, তুমি টেলিফোন করেছ মাত্র ন'মিনিট হয়েছে—ডাক্তার এলো বলে।

বলতে বলতে বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ডক্টর কেলার হাসিমুখে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে সারার আর্তনাদ, ও ডক্টর সেভ হিম —প্লীজ্, প্লীজ্—

রোগীর অবস্থা দেখে ভাল করে কিছু শোনার অবকাশ পেল না ডক্টর কেলার। সামান্য পরীক্ষা করেই ব্যাগ খুলল। পর পর ছুটো ইন্‌জেকশন দিল। তার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমার যন্ত্রণার অবসান। ঘুমে ছুই চোখ বুজে এলো। উঁচু বালিশে মাথা রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। পরে টের পেলাম চার ঘণ্টা। চোখ খুলে প্রথমে ঠাওর হল না আমি হাসপাতালে কি না। সামনে নার্স দাঁড়িয়ে, তার পাশে এক অচেনা ছোকরা—গলায় স্টেথো ঝুলছে, অর্থাৎ ডাক্তার। এক পাশে বিছানার সঙ্গে চেয়ার ঠেকিয়ে সারা বসে আছে। চোখ মেলে তাকাতে ব্যগ্র মুখখানা সামনে ঝুঁকল।—ও ডার্লিং, আর কষ্ট নেই তো?

ধোঁকা কেটেছে। ঘরেই শুয়ে আছি। পায়ের কাছে একখানা মূর্তির মতো বোমার দাঁড়িয়ে। ওর ওই গম্ভীর মুখ দেখলেই আমার হাসি পায়—অথচ প্রায় সর্বদাই গম্ভীর ও—হাজার হাজার দর্শক যখন ওর কাণ্ড-কারখানা দেখে হেসে কুটিপাটি, তখনো। এদিকের ছোট টেবিলে সারি সারি ওষুধ সাজানো। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে বটে, কিন্তু কি

হয়েছিল মনে পড়ছে। হেসে অভয় দিলাম সারাকে, বললাম, একটুও কষ্ট নেই।

ছোকরা ডাক্তার এগিয়ে এলো। পাল্‌স দেখল। বুক পরীক্ষা করল। নার্সের উদ্দেশে ইঙ্গিত করতে সে একটা ওষুধ খাওয়ালো। তারপর ছোকরা ডাক্তার মৃদু ফতোয়া জারি করল, ডক্টর কেলার না আসা পর্যন্ত কোনো কথা নয়।

অর্থাৎ ডক্টর কেলার আবারও আসবে। এই চার ঘণ্টায় আরো এসেছে কিনা জানি না। কত কিছুই তো হয়ে গেছে, ওষুধ এসেছে, নার্স এসেছে, সারাক্ষণ লক্ষ্য রাখার জন্য জুনিয়র ডাক্তারও এনে বসিয়ে রেখেছে।

কষ্ট আর সত্যিই নেই। আমার ভালো লাগছে। অকারণে কেন যেন হাসিও পাচ্ছে। ঘরের সব ক'টা মুখ এ-রকম গম্ভীর বলেই হয়তো। একটু বাদে জুনিয়র ডাক্তার বলল, আমি গিয়ে ডক্টর কেলারকে খবর দিচ্ছি। সারাকে অভয় দিয়ে আর আমাকে দু'বার করে কথা বলতে নিষেধ করে সে চলে গেল। আমার মনে হল যেন আপদ বিদেয় হল। নার্সটাও এই সঙ্গে গেলে অখুশী হতাম না। তবে মেয়েটার অল্প বয়েস আর মুখখানাও মিষ্টি—অতএব বিরক্তির কারণ নয়।

আমি বললাম, খিদে পেয়েছে—

শোনামাত্র সারা সচকিত। প্রথমে বোমারের দিকে তাকালো, তারপর নার্সের দিকে। ওর ছোট মেয়ের মতো হাঁসফাঁস অবস্থা দেখে আবার আমার হাসি পাচ্ছে। সারা বিপন্ন মুখ করে বলল, ওই ডাক্তারের সামনে বললে না কেন, এখন আন্দাজে আমরা তোমাকে কি খেতে দেব?

নার্স বলল, একটু গরম দুধ দেওয়া যেতে পারে।

আমি বাধা দিলাম—দুধ না।

—বা রে, এখন কি তোমাকে—এই যাঃ, তুমি কথা বলছ যে, ডাক্তার না তোমাকে বার বার বারণ করে গেল।

—খিদে পেলেও বলব না?

—না বলবে না, চুপ করে থাকো, একটু আগে চোখ কপালে তুলে দিয়ে এখন এটা খাব না সেটা খাব না—ডাক্তার আসুক তারপর দেখা যাবে।

আমি চুপ খানিকক্ষণ। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওই ভালো লাগার উসখুসুনি চলেছে। একটু বাদে মুখটা সামান্য বিকৃত করে নার্সকে বললাম, সিস্টার, ও-ঘরে গিয়ে টেলিফোনে ডক্টর কেলারকে ধরতে পারো কিনা দেখো তো—পেলে কখন আসবে জিজ্ঞেস করো।

—ডক্টর লটন তো গেলেন।

—সে কতক্ষণে গিয়ে তাকে ধরবে কে জানে, তুমি দেখো একবার।

সভয়ে আবার সামনে ঝুঁকল সারা।—কেন, কেন, ফের কষ্ট হচ্ছে?

আমি হ্যাঁ-না গোছের করে মাথা নাড়লাম। নার্স চলে যেতেই আমি একটু ঘুরে সানুনয়ে সারাকে বললাম, একটুও কষ্ট হচ্ছে না, আসলে ভয়ানক খিদে পেয়েছে, তুমি শিগগির খেতে দেবে কিনা বল—

—কি মুশকিল, আমি আন্দাজে কি খেতে দেব?

হাত বাড়িয়ে ওর দুটো কাঁধই ধরে ফেললাম।—বেশ ভালো করে একখানা চুমু।

—ধেৎ। মুখ লাল। যে-ভাবে ধরেছি পাছে এই শরীরে ধকল হয় সেই ভয়ে জোর করে সরতেও পারল না। গম্ভীর মুখেই বোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিকে পিছন করে ঘুরে দাঁড়াল। অর্থাৎ চক্ষু লজ্জা বর্জন করে আমার খিদে আমি মেটাতে পারি, ও দেখবে না।

ছেড়ে দিতে সারা চেয়ার ঠেলে দূরে সরে দাঁড়াল। মুখ লাল, চোখে বকুনি। বলে উঠল, তুমি এক নম্বরের শয়তান, এই নড়ানড়িতে কোনোরকম ক্ষতি হলে তোমাকে মজা দেখাব আমি—

নার্স ফিরল। কি বলতে গিয়ে থমকে তাকাল। সারা পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে, মুখ তখনো লাল। আর বোমার তখনো পিছন ফিরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল? পেলে?

—ডক্টর কেলার হাসপাতালে নেই।...ডক্টর লটন পৌঁছে গেছেন। ফোন ধরে আছেন, কি কষ্ট হচ্ছে জিজ্ঞাসা করছেন।

—কিছু কষ্ট হচ্ছে না।

—ও···আর বললেন দুধ ছাড়া এখন আর কিছু দেওয়া চলবে না।

—থাক, ব্যস্ত হয়ো না, আমি খেয়ে নিয়েছি। লটনকে ছেড়ে দিয়ে এসো।

বিমূঢ় নেত্রে নার্স একবার বোমার আর একবার সারার দিকে তাকালো। এরই মধ্যে কি খেয়ে নেওয়া হল বোধের অতীত যেন। কি বুঝল সে-ই জানে, ঘুরে তাড়াতাড়ি আবার প্রস্থান করল।

—তুমি একটা নির্লজ্জ, তুমি একটা বেহায়া!

রাগের মুখেই সারা হেসে ফেলল। বোমার আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল এতক্ষণে। তেমনি নির্লিপ্ত গম্ভীর।—তুমি একটা কইমাছ, কেটেকুটে তেলে ছাড়লেও দাপাদাপি ঝাঁপাঝাঁপি করতে পারো।

দু' দু'বার আমরা অনেক দিন করে ইণ্ডিয়ায় দল নিয়ে ঘুরেছি। আমি আর সারা তো কর্তা অর্থাৎ শ্বশুরের আমলেও গেছি। বোমারের নেশার মধ্যে খাওয়ার নেশা, নিজে রাঁধেও ভালো। কইমাছ কি বস্তু জানে।

হেসে ওঠার আগেই টেলিফোন ছেড়ে নার্স হাজির আবার। জানান দিল, ডক্টর কেলার হাসপাতালে ফিরেছেন, তিনি একেবারে ব্লাড রিপোর্ট নিয়ে আসবেন···কিছু দেরী হতে পারে। এর মধ্যে তিনিও কথা বলতে বা নড়াচড়া করতে বারণ করছেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাগত মুখে সারা ঘর ছেড়ে প্রস্থানের উদ্যোগ করল। তার আগেই গলা দিয়ে আমি একটা যন্ত্রণা-সূচক শব্দ বার করলাম। চকিতে ফিরল। এগিয়ে এসে নার্সের সামনেই আমাকে ধমকে উঠল, চালাকি হচ্ছে?

কথা বলা নিষেধ, অতএব বিষণ্ণ মুখে আমি আঙুল দিয়ে চেয়ারটা দেখালাম। অর্থাৎ বোস—।

নিরুপায় মুখ করে সারা আবার বসেই পড়ল।

চিঁ-চিঁ শব্দ বার করে নার্সের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, এর মধ্যে ব্লাড নেওয়াও হয়ে গেছে?

জবাবটা ঝাঁঝালো সুরে সারাই দিল।—এই চার ঘণ্টায় কত কি হয়েছে তুমি তো সবই জানো।

নার্সের উক্তি থেকে বোঝা গেল হার্টের ব্যাপার কিছু কিনা রক্তের এই বিশেষ পরীক্ষা থেকে বোঝা যাবে। অতএব যতক্ষণ না রিপোর্ট আসছে ততক্ষণ নড়াচড়া বন্ধ।

ডক্টর কেলারের ব্যস্তসমস্ত হাসিমুখ দেখা গেল আরো ঘণ্টা দুই বাদে। দরজা থেকেই বলতে বলতে ঢুকল, নাথিং রং, অ্যাবসোলিউলি নাথিং। স্ট্রোক ভেবে তোমার বউই আধা-অজ্ঞান, ওর ভয় দেখেই চেক্ আপ করে নিলাম। ডিওডিন্যাল আলসারের সঙ্গে উইণ্ডের আপওয়ার্ড অবস্ট্রাকশনের ফলে ওই কাণ্ড হয়েছিল। দু-হাতে বিছানায় ভর করে সামনে ঝুঁকল।—খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম করেছিলে?

—না তো।

—নিশ্চয় করেছিলে। সারা সজোরে বাধা দিয়ে উঠল, ডোণ্ট্ বিলিভ হিম, আমি বলছি ডক্টর, নিশ্চয়ই অনিয়ম করেছিলে।

—কি অনিয়ম করেছিল?

সারা থতমত খেল।—তা তো জানি না।

ডক্টর কেলার সশব্দে হেসে উঠল। তারপর পাশে বসে ব্লাড-প্রেসারের যন্ত্র খুলল।

বিনীত মুখ করে আমি বললাম, ডক্টর···ইয়ে, আমি এর মধ্যে একটু অন্যায় করে ফেলেছি···মানে একটু নড়াচড়া করে ফেলেছিলাম, ক্ষতি হবে না তো?

হাতে কাপড় জড়াতে জড়াতে ডাক্তার মাথা নাড়ল, কিছু না, কিছু না, ব্যট্ ইউ শুডন্ট্ হ্যাভ—

সারার মুখ লাল আবার। এই সুফলটুকু দেখার লোভেই জিজ্ঞাসা করা। ডাক্তারের আড়ালে দাঁড়িয়ে ও চোখ দিয়ে শাসাচ্ছে আমাকে। আর দু-চোখের সাদা বার করে বোমার ড্যাব ড্যাব করে দেখছে আমাদের।

নিশ্চিন্ত করার পরেও ডাক্তার খুব নিবিষ্টভাবে আবার পরীক্ষা করল আমাকে। সেই ফাঁকে দু-চোখ ভরে আমি একটা দৃশ্য দেখলাম। ডাক্তার যতক্ষণ আমার প্রেসার দেখল, হার্ট দেখল, পালস্ দেখল পেট দেখল, ততক্ষণ পর্যন্ত সারার সমস্ত মুখ এমন কি সমস্ত ভেতর সুদ্ধু যেন উৎকণ্ঠিত, উদগ্রীব। একাগ্র দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকেই চেয়ে আছে। ডাক্তারের মুখে অথবা ভুরুর ফাঁকে এতটুকু উৎকণ্ঠার ভাঁজ পড়ছে কিনা খুঁটিয়ে দেখছে। যেন এর ওপরেই জীবন-মরণ নির্ভর।

শেষে আবার নিরাপদ রায় শুনে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। দৃশ্যটা বুকের তলায় একটা সুখের প্রলেপের মতো।

যন্ত্রপাতি গোটাতে গোটাতে ডক্টর কেলার হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল, ব্যথাটা প্রথম টের পেলে কখন?

ভয়ে ভয়ে একবার সারার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, সকাল থেকেই চিনচিন ব্যথা করছিল—

সারার দু-চোখ বড় হয়ে উঠছে।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করল, তারপর?

—তারপর ভয়ানক বেড়ে গেল, ঘণ্টাখানেক পর্যন্ত সে-এক বিষম অবস্থা·· এ-রকমটা আগে আর কখনো হয় নি।

—এক ঘণ্টা ধরে কষ্টে উথাল-পাথাল করলে অথচ কাউকে ডাকলে না। সারার যদি ফিরতে আরো এক ঘণ্টা দেরী হত?

অসহায়ের মতো বলে ফেললাম, আমার কি সর্বনাশ যে করলেন ডক্টর জানেন না।

ডাক্তার অবাক।—কেন?

—এরপর একঘণ্টা ধরে ওর কাছে আমাকে এই কৈফিয়তই দিতে হবে। ওকে বলে যান আমার বেশি কথা বলা নিষেধ।

ডাক্তার হাসতে লাগল। সারার দিকে ফিরল একবার। ওর মুখ থমথমে হয়ে আসছিল সত্যিই। সৌজন্যের খাতিরে হাসতে চেষ্টা করল একটু। ডাক্তার আমাকে বলল, তোমাকে কষে বকাই উচিত, যে-রকম যন্ত্রণা হচ্ছিল বিপদ হতেও পারত, বাট ইউ আর এ ব্রেভ নটি বয়—

হাসিমুখে ডাক্তার দরজার দিকে পা বাড়াল। সারা সঙ্গ নিল। কি জানি, যদি আড়ালে কিছু বলে, যদি এখনো ভয়ের কিছু থেকে থাকে।

তারা ঘর থেকে বেরুতে আমি বোমারের দিকে তাকালাম। বোমার আমার দিকে। ওর চিরাচরিত ভাবলেশশূন্য মূর্তি। একটা চোখ শুধু বার বার বুজিয়ে ও আমাকে চোখের খেলা দেখাতে লাগল।

আমি ছদ্ম-কোপে চোখ পাকালাম।—ফ্র্যাংকি, আমি তোমার মনিব খেয়াল আছে ?

বোমার মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকার করল। সারা ঘরে ঢুকল। মুখখানা এরই মধ্যে রাগে গনগন করছে। ওর রাগ আগেও দেখেছি এখনও দেখছি। আগে বীভৎস মনে হত, এখন মিষ্টি লাগে।

বোমার তার দিকে ঘুরল। একটা চোখ তেমনি বুজছে আর খুলছে।

সারা এখন হাসবে না পণ। রাগত মুখ করেই বলে উঠল, অসভ্য কোথাকার।

বোমার আবার মাথা ঝাঁকিয়ে এই বিশেষণও স্বীকার করল।

সারা আরো রেগে গেল।—এখন যাও বলছি এখান থেকে।

বোমার ঠাণ্ডা মেরে গেল।—কেন, আবার তোমরা নড়ানড়ি করবে ?

এবারে হাসি ঠেকানো দায়, তবু সারা সকোপে চেষ্টা করছে ঠেকাতে। বোমার বুক ফুলিয়ে সটান বেরিয়ে গেল।

সারা প্রস্তুত হয়ে এবারে আমার দিকে তাকালো। আমি অমায়িক হেসে ওর একটা হাত ধরতে গেলাম।

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল। মুখের মেঘ সত্যিই অকৃত্রিম।—তুমি আমাকে পেয়েছ কি ?

—কেন, আমার বউ।

রাগে ভেংচি কেটে উঠল।—তোমার বউ! বেশি রাগ হলে ও বরাবরই ভেংচি কাটে।

—তাহলে শাশুড়ী বলব ?

ঝুপ করে বসল বিছানায়।—দেখো তোমাকে একটা স্পষ্ট কথা বলে দিই। আমি ভালো মেয়ে না আমি জানি, যতদূর অসৎচরিত্র আর খারাপ হতে হয় আমি সেই—আমাকে তুমি যে-ভাবে খুশি শাস্তি দাও, তা বলে নিজের শরীর মাটি করে আমাকে এ-ভাবে জব্দ করতে চেষ্টা করলে আমি বরদাস্ত করব না। একদিন তোমার ওই দেরাজের রিভলবার বার করে নিজের খুলি উড়িয়ে দেব বলে দিলাম।

আবার দু'চোখ ভরে দেখছি ওকে। ভাবতে অবাক লাগে একটা মানুষের মধ্যে কত রকমের মানুষ থাকতে পারে, একটা মেয়ের মধ্যে কত রকমের মেয়ে থাকতে পারে। জীবনভোর কি আমি শুধু এই আবিষ্কারই করে যাব?…আর এ কি সেই সারা, যে আমার তাজা রক্তে ওর সর্ব অঙ্গ ভিজিয়ে নিতে পারলে পিশাচীর মতো খিল খিল করে হেসে রডনির বুকের ওপর গড়াগড়ি খেতে পারত।

…সেই সারাই বটে। কিন্তু সে নয়। ওই খোলশে আর একজন। অদ্ভুত ভালো লাগছে। কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে করছে। তা করতে গেলেই ফোঁস করে উঠবে। ঘটা করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলাম, বাঁচা গেল, নিজের মাথার খুলি ওড়াবে, আমার নয়!

—ইয়ার্কি পেয়েছ? ডাক্তার বলে গেল না বিপদ হতে পারত?

খুনসুটি করার লোভ দমন করা গেল না। এক হাতে ওকে ধরে রেখে বললাম, বিপদ তো কতরকম ভাবেই হতে পারে গাচ্ছা ধর, বিপদ যদি একদিন হয়েই বসে, তুমি কি করবে?

রাগে মুখ লাল তক্ষুনি। ভেংচে কেটে বলে উঠল, কি করব তুমি জান না? আমাকে তুমি চেন না? আর কাউকে না পাই তো তোমার ওই ওগাধ টাকাকড়ি নিয়ে হয়তো আধবুড়ো বোমারের গলাতেই ঝুলে পড়ব। বুঝলে?

বারান্দার দরজার আড়াল থেকে বোমারের গলাখানা শুধু বেরিয়ে এলো। তার উক্তি কানে আসতে দুজনেই চমকে তাকালাম সেদিকে। চোখ পিট পিট করে ও বলছে, বড় লোভনীয়, গলা টিপে দেব ব্ল্যাকিটাকে খতম করে?

মুখের ওপরেই বোমার এক-এক সময় আমাকে ব্ল্যাকি' বলে বসে। আমি মনিব, আমি ওদের শতখানেক মেয়ে-পুরুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—তবু। আর সত্যি কথা বলতে কি, শুনলে সারা এখন রেগে যায়, কিন্তু আমার ভালো লাগে। আগেও লাগত।

নাটকের এই ছন্দপতনে সারাও না হেসে পারল না। বোমারের মুখ সরে গেল। জুতোর জোরে জোরে শব্দ করে বুঝিয়ে দিল এতক্ষণে সত্যিই চলে যাচ্ছে।

আমার বুকের ওপর ঝুঁকে এলো সারা। বুকে থুতনি ঘষতে ঘষতে বলল, তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না, তোমার সব মিথ্যে, সব ছল। শরীর খারাপ হয়েছিল টের পেয়েও বেরুবার আগে আমাকে কেন বলনি? কেন, কেন…

আমি ওর গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। এ কোন জাতের সুখ যে আমার মতো মানুষের চোখের কোণ সিরসির করতে পারে! বিড় বিড় করে বললাম, সত্যি বলছি এতটা হবে বুঝিনি—যন্ত্রণার সময় আমি তো কেবল তোমাকেই খুঁজছিলাম, এক একটা মিনিট এক-এক ঘণ্টা মনে হচ্ছিল।

ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল বার দুই টের পেলাম। আবেগ, হয়তো বা সেই সঙ্গে চোখের জলও সামলাবার তাগিদে ও আমার বুকে জোরে জোরে মুখ আর থুতনি ঘষতে লাগল।

শোয়া অবস্থাতেই আমি ঘাড় নীচু করে ওকে দেখতে চেষ্টা করছি। আমার নাকের ডগা ওর মাথায় ঠেকছে। চুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি, আর জামার ওপর দিয়ে নরম বুকের উষ্ণ তাপ। অনেক—অনেক কালের উপোসী কাঁপা শরীরটা যেন আমার ভরাট হয়ে উঠছে। ইদানীং অনেক পাচ্ছি, তবু তৃষ্ণার শেষ নেই। মনে হয় এই প্রথম পেলাম, প্রথম ভরাট হলাম।

দেখছি, হঠাৎ কি মনে হতে একটু জোরেই হেসে ফেলে নিজের সুখে বাদ সাধলাম!

ও চমকে অর্ধেকটা উঠে বসল, আমার দু'দিকে দু'হাত।—কি?

—বোমায়ের সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল।

—কি কথা?

—ওই যে বলেছিল, কালির ডোবায় একখানা তাজা হলদে গোলাপ সাঁতার কাটছে।

দিন দশেক আগের কথা, বুকের ওপর শুয়ে সারার আমাকে আদর করার ঝোঁক চেপেছিল। দৃশ্যটা জানালা ফাঁক করে বোমার দেখেছিল, আর পরে ওই মন্তব্য করেছিল।

সারার চোখ দুটো চকচকে, মুখে হাসি ভাঙল। বলে উঠল, বোমারের মুখ আমি একদিন ভোঁতা করে দেব বলে দিলাম, আশকারা দিয়ে তুমি ওকে মাথায় তুলেছ। তোমাকে ব্ল্যাকি বলবে, কালির ডোবা বলবে—এ-সব কি? ও নিজে কোন আকাশের চাঁদখানা?

আমি হাসছি। সেই ফাঁকে ওকে আরো ভালো করে দেখছি। আর সেই পুরনো কথাই ভাবছি। আমি আমার বাঘ-সিংহগুলোকে চিনি, জানি। নড়া-চড়া দেখলে ভাব-গতিক বুঝতে পারি, চোখের দিকে তাকালে ওদের মতলব বুঝতে পারি।···কিন্তু মানুষ? সব থেকে বেশি চেনা আর জানা হয়ে গেছে ধরে নিয়ে যাদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে আমি জন্তু-জানোয়ারদের দিকে তাকিয়েছি, যাদের কাছ থেকে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আমি ওদের দিকে সরে এসেছি, ঢের-ঢের বেশি সৎ আর অকৃত্রিম ভেবেছি—তাই কি আমার চেনা-জানার শেষ কথা? তাহলে ইদানীং ভিতরটা আমার এমন ভর-ভরতি কেন? এত কাল তো এমন হয়নি!

মানুষ চেনা কি সত্যি শেষ হয়েছে? বিশেষ করে এই মেয়েমানুষ!

॥ দুই ॥

আমি টনি কার্টার, বয়েস ছত্রিশ।

আর ওই আমার স্ত্রী সারা কার্টার। বয়েস তেত্রিশ। ফ্র্যাংকি বোমার বলে, সতেরোয় যেমন দেখেছি তেইশে তার থেকে ঢের ভালো দেখেছি। আর তেত্রিশে? বোলো না, বুকের ভেতরটা একেবারে জ্বলে গেল বন্ধু, জ্বলে গেল, দেখলে আমার এই সাতচল্লিশ বছরের শরীরটাতে সাতাশের যৌবন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তোমার বউয়ের যত দোষই থাক, বয়েস ধরে রাখার জাদু জানে।

আমার বউ।···আমার স্ত্রী। হ্যাঁ, আমি যখন টনি কার্টার আর ও যখন সারা কার্টার, আমারই বউ, আমারই স্ত্রী বইকি। ঠিক সতেরো বছর বয়সে সারা জেনট্রি সারা কার্টার হয়েছে। ষোল বছর আগের কথা। আমার বয়েস তখন মাত্র কুড়ি, যখন দূর থেকে আমি শুধু ওকে দেখতাম চেয়ে চেয়ে—দেখার বাইরে আর কোনো সম্ভাবনার জাল বুনতে সাহসে কুলাতো না।

যা পাবার কথা নয় তাই পেয়েছি। আবার পাবার পর যা হবার কথা নয় তাই হয়েছে। বিশ্বাস করবেন, ছ'মাস আগে পর্যন্ত ষোল বছরের স্ত্রীকে ষোল দিনের জন্যও আমি কাছে পাইনি? দৈবাৎ পশু-বলে কখনো ওর শরীরটার ওপর দখল নিয়েছি হয়তো, কিন্তু তার বদলে ও আমাকে ঘৃণার আগুনে দগ্ধেছে। শুরু থেকে ও আমাকে একটা পশু ছাড়া আর কিছু ভাবেনি। ছ'মাস আগে পর্যন্ত ভাবেনি। অবাস্তব, আমার জীবনের যা-কিছু সব অবাস্তব। বিয়ের পরের এই ষোলটা বছরও মোটামুটি আমরা একসঙ্গে ঘুরেছি, এক জায়গায় প্রায় পাশাপাশি কাটিয়েছি—কিন্তু ভিতরের এতবড় ছাড়াছাড়ি সত্বেও বাইরে ছাড়াছাড়ি হয়নি—আনুষ্ঠানিক ছাড়াছাড়ি তো হয়ইনি। আশ্চর্য, এই ষোলটা বছর ধরেই দুজনে আমরা দুজনের বিরুদ্ধে ছুরি

শানিয়েছি—যে ছুরি শুধু নির্মমতম সংহার ছাড়া আর কিছু জানে না —কিচ্ছু জানে না।

সারা কেন আমাকে ছেড়ে যায়নি তার অনেক কারণ থাকতে পারে। কয়েকটা কারণ স্বতঃসিদ্ধ বলে ধারণা আমার। প্রথম আর প্রধান কারণ প্রতিহিংসা। এই এতবড় প্রতিষ্ঠান, এত টাকা-কড়ি, সব-কিছুর একচ্ছত্র মালিক ওর হবার কথা। আর আমার সেখানে ক্রীতদাসের ভূমিকা। এক পাগলের পাল্লায় পড়ে সব খোয়াতে হয়েছে ওকে। (···সারার বাবা মারভিন জেনট্রি কি পাগল ছিল? কি জানি।) আর এই ক্রীতদাসের ললাটে রাজতিলকের ছাপ পড়েছে। সেই সঙ্গে বন্দুকের নল বুকে ঠেকিয়ে রাজকন্যাকেও তার হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে। (তবু সারার বাবা মারভিন জেনট্রি লোকটা কি পাগল ছিল? আমি জানি না। ···উন্মত্ত পাগলামির শেষ ফসল কি এ-রকম হতে পারে?) বলির পশুর মতো কাঁপতে কাঁপতে সতেরো বছরের সারা জেনট্রি রাতারাতি সারা কার্টার হয়ে গেছে। কিন্তু ফ্র্যাংকি যা-ই বলুক, বয়েসটা তার সত্যিই এক জায়গায় আটকে নেই। বাপের প্রতি তার অপরিসীম ঘৃণা আর বিদ্বেষের পরিণাম আমি—সারা কার্টারের জীবনে আমি টনি কার্টার। আমাকে ছেড়ে ও কি পাবে? বরং আমাকে সরাতে পারলে আবার সব পাবে, সব হবে। মিস্টার কার্টার মুছে গেলে তার সব বিত্ত তো মিসেস কার্টারেরই প্রাপ্য।···মুছে যেতাম, ও মুছেই দিত আমাকে যদি না সেই গোড়া থেকেই সতর্ক সচেতন থাকতুম আমি, যদি না কুকুরের মতোই আগে থাকতে বিপদের গন্ধ পেতাম। তাছাড়া, আমাকে ছেড়ে গেলে ছেলেবেলা থেকে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবার যে উচ্ছল রোমাঞ্চকর জীবনে অভ্যস্ত, আর যে অপরিমিত সচ্ছলতার মধ্যে অভ্যস্ত, আমার কাছ থেকে সরে গেলে সেই ঔজ্জ্বল্যে মরচে ধরবে।

দ্বিতীয় কারণ, রডনি। প্রতিষ্ঠানের এস্ স্টার রডনি ওয়েনস্টন। আটটা বাঘ আর আটটা সিংহকে চাবুক হাতে না নিয়েই একসঙ্গে লপটা-লপটি খাওয়ায়, এর কাঁধে ওকে চড়ায়, ওর কাঁধে একে। বাঘ

আর সিংহকে একসঙ্গে গলাগলি করে শুইয়ে রাখে। আরো এত সব কাণ্ড করে যে দেখে দর্শকদের মধ্যে ত্রাস আর রোমাঞ্চ মেশানো হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সবশেষে আবার এই রডনিই তিরিশ গজ মোটর-জাম্পিং দেখিয়ে দর্শকের স্নায়ু ঠোঁটের ডগায় এনে ছাড়ে।

এমন গুণী বিরল।

সুপুরুষও বটে। অন্তত আমার পাশে তো বটেই। মর্কটের পাশে মরকত মণি।

তার মতো গুণীকে পৃথিবীর যে-কোন প্রতিষ্ঠান আদর করে ডেকে নেবে--অবশ্য ও যদি যায়। যায়নি। যাবে না, এখানেও অঢেল টাকা পায়, কিন্তু সেজন্যে নয়। যাবে না, সারা যেতে রাজী নয় বলে। আর, যাবেই বা কেন, আমি টনি কার্টার সরে গেলে যেখানে মালিক হবে মালিকানীও পাবে—সেখান থেকে চলে যায় কোন মূর্খ? মালিক না হয় দু'দিন পরেই হবে, মালিকানী তো অধরা নয়। আমার যতদূর খবর, সব তুচ্ছ করে প্রেমে হাবুডুবু সারা কার্টার এক এক সময় রডনিকে নিয়ে দূরে সরে যেতে চাইলেও—সে-ই বুঝিয়ে সুজিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করেছে। সবুরে মেওয়া ফলে বুঝিয়েছে। হিংস্র বাঘিনীর বুকেও যখন যৌবন জ্বলে তখন সে দিশেহারা। সারার বুকেও সেই যৌবন জ্বলেই আছে। আমার প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসায় সে-যৌবন আরো অনির্বাণ।

…কিন্তু সারা না গেলেও এত জেনে এত বুঝেও আমি সারাকে জীবন থেকে নির্মূল করে দিইনি কেন? দেব দেব করে ষোল বছর কাটিয়ে দিলাম কি করে? আইনের রাস্তায় যেতে পারতুম। না হয় কিছু খরচা হত, লাখ খানেক টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হত। অনেক আছে। কিন্তু তাতে যে ক্ষতি আমার হয়ে গেছে তা পূরণ হত না। নির্মম প্রতিশোধের ছুরি আমিও শানাচ্ছিলাম। ওর ওই নরম বুকের তলার উষ্ণ তাজা রক্তের স্বাদ নেবার প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমি তো জানোয়ার (সামনে আড়ালে সারা সর্বদাই আমাকে ওই বলত)—তাই তাজা রক্ত বড় প্রিয়। বাড়ুক, বেড়ে বেড়ে আশা আর আনন্দের

প্রায় চূড়ায় উঠুক, তারপর যম দেখবে, যমের অট্টহাসি শুনবে। সব জেনে সব বুঝেও রডনিকে আমি সরিয়ে দিইনি। কেন দেব? প্রথম কথা, আমি ব্যবসায়ী না? ওর দাম জানি না? কদর বুঝি না? দ্বিতীয় কথা, কার জন্যে তাড়াব ওকে, সরাব ওকে? যার জন্য, তার অস্তিত্ব তো হিসেবের খাতায় জমাই পড়ে গেছে। তার থেকে দুজনেই ওরা থাকুক, বাড়ুক, আশা আর আনন্দের চূড়ায় উঠুক।

না, রডনি আমার হিসেবের বাইরে। আমার সমস্ত লক্ষ্য সারা। রডনি উপলক্ষ মাত্র। ওই গোছের পরস্ত্রী দখলে এলে সকলেরই মুণ্ডু ঘোরে। রডনির দোষ দেব কেন? নিজেকে অবিবেচক ভাবি না। আমার জীবনে শুধু একটিই লক্ষ্য, একটিই প্রতীক্ষা। লক্ষ্যের অস্তিত্ব ঘোচানোর প্রতীক্ষা।

....কিন্তু লক্ষ্যের দিকে চেয়ে চেয়ে ষোলটা বছর কেটে গেল। ষোল বছরেও প্রতীক্ষার অবসান হল না? কেন···? সুযোগ মেলেনি? যেমন চেয়েছিলাম তেমন সুযোগ মেলেনি? সে-কি হতে পারে? একদিন দুদিন পাঁচ দিন নয়, এক বছর দু'বছর পাঁচ বছর নয়—চাইলে ষোল বছরেও সুযোগ মিলবে না এ কি হতে পারে? নিজেকে ধোঁকা দিতাম, চলুক না, শেষ করলেই তো সব শেষ—অত তাড়া কিসের?—আজ বুঝতে পারছি ধোঁকাই দিতাম নিজেকে। এখন বুঝতে পারি কেন সুযোগ আসেনি, কেন একে একে ষোলটা বছর কেটে গেছে। আসলে ওই মেয়েকে আমি ভালবাসি। ব্যভিচারিণী হবার আগেও, পরেও। ওই মেয়ের অস্তিত্ব আমার অণুতে অণুতে ছড়িয়ে আছে। ওর সেই খামখেয়ালী নিষ্ঠুর বাবা যেদিন ওকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে—সেই দিন থেকে।···হয়তো বা তার আগে থেকেও। ও যত আমাকে ঘৃণা করেছে, বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে যত দূরে সরে যেতে চেয়েছে, আমার আকর্ষণ তত বেড়েছে। তত বেশি ওর জন্যে পাগল হয়েছি আমি। ওর ঘৃণায় বিদ্বেষে ষড়যন্ত্রে আমার এই আকর্ষণ এই ভালবাসাই হিংসার আকারে পরিপুষ্ট হয়েছে। হিংসার জাল ফেলে ওকে আমার সেই অস্তিত্বের মধ্যেই ধরে রেখেছি। এ সত্যটা আগে আমি অনুভব

করিনি, কিন্তু অন্তরাত্মা করেছিল বোধহয়। সে জানত, ওর বিনাশ নিজের বিনাশের সামিল।

…তাই ষোল বছরেও সময় হয়নি—সুযোগ মেলেনি।

তুনিয়ার মানুষ বলবে কুৎসিত টনি কার্টারের স্ত্রী সারা কার্টার ব্যভিচারিণী। তুনিয়ার মানুষ কেন, সারা নিজেই তো বলে। শুধু বলে না, এক-এক সময় নিজেকে সংহার করার খুন ওর চাপে মাথায়। (এখন কিছুটা কমেছে।) ওর ভয়ে আমার রিভলবার এখন কোথায় রেখেছি সে এক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। বোমার অবশ্য সান্ত্বনা দেয়, ওই গোছের অঘটন যদি ঘটে এর পরেও, তাহলে আমাকে তুমি বাঘের খাঁচায় ফেলে দিও।

তবুও আমার মনে ভয়। তুনিয়ার মানুষ ওকে ব্যভিচারিণী বলে বলুক। আমি কেয়ার করি না। আমি বলব, ব্যভিচারিণী ছিল। যা ছিল সেটা সত্য। বিকৃত সত্য। আর, আজকের এই রূপটাও সত্য। ততধিক সত্য। নিখাদ সত্য।

…সেদিনের অসুস্থ শয্যায় ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হঠাৎ যদি বিপদই হয়ে বসে কিছু, ও কি করবে।…কি করবে আমার জানাই আছে। আগে হলে বিকৃত আনন্দে জ্বলে উঠত, ব্যভিচারী আনন্দের হাট বসিয়ে দিত। এখনো জ্বলবে। সব-কিছু নিয়েই বিচ্ছিন্ন তপস্বীর মতো জ্বলবে। কারো বিরুদ্ধে এতটুকু অভিযোগ থাকবে না। প্রাপ্য শাস্তি পেয়েছে ভাববে।

আমার তুটো প্রাপ্তিযোগ। এতবড় এক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা, আর সারা। সারা আগে, মালিকানা পরে। কিন্তু তারও আগে অনেক কথা।

…ছেলেবেলা থেকেই নিজেকে বঞ্চিত অভিশপ্ত ভাবতাম আমি। নাক চোখা, চোখ উজ্জ্বল, গায়ের চামড়া বাদ দিলে মুখও কুৎসিত বলবে না কেউ। কিন্তু ভেনাসের অঙ্গে আলকাতরা মাখালে ক'জন ফিরে তাকাবে তার দিকে ?

গায়ের রংই সব খেয়েছে। আবলুশ কাঠের মতো ঝকঝকে কালো। নিজেকে অভিশপ্ত ভাবার সেটাই কারণ নয়। আয়নার সামনে দাঁড়ালে এরই মধ্যে একটা রূপ আবিষ্কার করতে খুব কষ্ট হত না। এই ঝকঝকে রংয়েরও এক ধরণের বৈশিষ্ট্য আছে বই কি।

আমার বাবা কে, মা কে, আমি জানি না। আমি কোনো বাবা-মায়ের বৈধ সন্তান কিনা তাও জানি না। থাকতাম উকগুষের এক জঙ্গলের ধারে গীর্জার আবাসে। আর জ্ঞান হতে দেখেছি গোমেজকে। গীর্জা দেখাশুনার ভার তার। সে-ও আমার মতোই পলিশ-করা কালো-কুলো। বিশ্বাস, ও-ই আমার বাবা। ষণ্ডামার্কা চেহারা। চড়-চাপড় যখন কষাতো, চোখে লাল নীল হলদে সবুজের মিছিল দেখতাম। তার শোবার ঘরের দেয়ালে এক রমণীর ছবি টাঙানো—পোশাক-আসাক আমাদেরই মেয়ের মতো, কিন্তু মুখের ছাঁদ-ছিরি অন্যরকম। ছবিতে গায়ের রং বোঝা যায় না, কিন্তু মুখখানা বেশ সুশ্রী। আমার কেমন মনে হত ও-ই আমার মা। বছর দশ-এগার বয়সে গোমেজকে একদিন জিজ্ঞাসা করে বসেছিলাম, ও কি আমার মা ?

জবাবটা সে গালের ওপর বসিয়ে দিয়েছিল। মাথা ঘুরে তিন হাত দূরে গিয়ে পড়েছিলাম। পরে শুনেছি, রমণীটি প্রাচ্যদেশের কোন এক নাম-করা নেটিভ পাদ্রীর বউ। বেড়াতে এসে এখানেই থেকে গেছল দুজনে। নেটিভ পাদ্রীটি নাকি মহান পুরুষ ছিল, গৃহী হলেও ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছিল। তার টানে বহু দূর থেকেও নাকি এই গীর্জায় লোক আসত তখন।

একবার চড় খাবার পর আর কোনো বে-চাল জিজ্ঞাসা আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি। কিন্তু মনে সেটা অষ্টপ্রহর দাগ কাটতই। চড় খাবার পরে বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল, ও-ই আমার মা। বাবা কে সে তো আগেই ধরে নিয়েছি। বয়েস একটু বাড়তে চড় খাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করেছি। অন্যের চোখে ভগবানে সমর্পিত নেটিভ পাদ্রীর বউও মহীয়সী হবে বইকি। গোমেজ সেখানে গীর্জারক্ষক। তাদের কেলেঙ্কারির ফল আমি, এ-কথা রাষ্ট্র হলে বেচারা তো ধনে-প্রাণে বধ হবে। সকলে

জানে, গোমেজ আমাকে দূরের কোন এক জঙ্গলে কুড়িয়ে পেয়েছে। মনে মনে কি জানে আমি জানি না।

আমার অনুমান যদি সত্যিও হয়, তাহলেও নিজেকে আমি ওদের ভালবাসার সন্তান বলে ভাবতে পারতুম না। ভালবাসার সন্তান হলে গোমেজ এক-এক সময় আমার ওপর এত নিষ্ঠুর হয় কি করে?…অবশ্য ওকে ছেড়ে আসার আগে আমার সে-ভুল ভেঙেছিল। আমার ধারণা ও আমাকে লোক দেখানো শাসন করত, যাতে না কারো কোনো-রকম সন্দেহ হয় সেইজন্য। অবশ্য এমনিতেই মানুষটা অবুঝ রকমের রগচটা।

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের মনে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতাম। জঙ্গলের পশু-পাখির পিছনে ছোটাছুটি করে দুরন্তপনা করতাম। গোমেজকে ফাঁকি দিতে পারলে সকালেও ঘরের খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়তাম। ফিরলে ঠেঙানি। সকালে সে আমাকে ঠেঙাতে ঠেঙাতে তখনকার স্বজাতীয় পাদ্রীর কাছে পড়তে নিয়ে যেত—আবার ঠেঙাতে ঠেঙাতে নিয়ে আসত। পাদ্রী একবার বললেই হল আমার পড়াশুনায় মন নেই। বলতই। কারণ, বই দেখলে আমার গায়ে জ্বর আসত।

…তখন বয়েস আমার তেরো কি চৌদ্দ। শুনলাম শহরে মস্ত এক সার্কাস পার্টি এসেছে বাইরে থেকে। চমকপ্রদ সব কসরৎ দেখাচ্ছে। তাদের সঙ্গে হাতী ঘোড়া বাঘ সিংহ কত কি আছে। শুনেই ছ'মাইল রাস্তা হেঁটে মেরে দিলাম। যা দেখলাম চক্ষু ছানাবড়া আমার। বিশাল চত্বর জুড়ে তাঁবু পড়েছে। খাঁচায় সত্যিই বাঘ ভালুক সিংহ শিম্পাঞ্জী আরো কত কি। দলে কত রকমের লোক, কত রকমের মেয়ে। তারা নাকি দড়ির খেলা দেখায়, ছোরার খেলা দেখায়—চারতলা সমান উঁচু তারের ওপর নাচে, সাইকেল চালায়।

—এই ব্ল্যাকি। ইধার আও।

ঘুরে তাকিয়ে আমি হতভম্ব। বছর চব্বিশের একটা জোয়ান লোক কুতকুত করে আমার দিকেই চেয়ে আছে, আমাকেই ডাকছে।…সাহস তো কম নয়, দেব নাকি একটা পাথর ছুঁড়ে মাথার খুলি উড়িয়ে।

তারপর মনে হল ঠিক এখানকার লোকের মতো মুখের আদল নয় লোকটার। সার্কাস পার্টির কেউ নয় তো?

এগিয়ে গেলাম। আমার হাত ধরে সামনে টেনে লোকটা খুব গম্ভীর মুখে আমার বাহুর চামড়ার ওপর বার কয়েক আঙুল ঘষল। অর্থাৎ আমার গায়ের রং খাঁটি কিনা দেখল। আমার হাত নিশপিশ করতে লাগল। এই গোছের ব্যবহারের জবাবে নাকের ওপর ধাঁ করে এক-ঘা বসিয়ে আমি চোখের নিমেষে হাওয়া হয়ে যেতে পারি। ও হাজার চেষ্টা করলেও ছুটে আমার টিকির নাগাল পাবে না···কিন্তু লোকটা কে আগে দেখাই যাক না।

—তোমার নাম কি?

—বাবা। চোখ পিট পিট করে জবাব দিল। লোকটার কানের নীচ অবধি দু'দিকে মোটা জুলফি, থুতনির নীচে ছুঁচলো এক-চাপ দাড়ি। কিন্তু গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো।

—বাবা আবার কারো নাম হয় নাকি?

—ডাকলেই হয়। বাবা ডাকলেই বাবা, তুই ডাক, তোরও বাবা হয়ে যাব।

খুব ছেলেবেলা থেকে আমার মাথায় অনেক রকমের কু-বুদ্ধি খেলত। অন্যদিকে আমার জীবনে বাপ-মায়ের অস্তিত্ব নেই বলেই হয়তো তলায় তলায় একটা চাপা ক্ষোভ ছিল। বললাম, আমি বাবা ডাকলে আমার মা তোমাকে কি ডাকবে?

মুখের দিকে চেয়ে পিট পিট করল খানিক। বেজায় গম্ভীর অথচ রগড়ের লোক বোঝাই যাচ্ছে। জবাব দিল, তোর যে রকম পাকা রং, তোর মা-ও বাবা ডাকলেই ভালো হয়।

লোকটা কে আগে বুঝে নি, তারপর আমি কেমন ছেলে, তা বুঝিয়ে দেব।

—তুমি এই সার্কাসের লোক?

মাথা নাড়ল। সার্কাসেরই লোক।

আমি আশান্বিত।—কি করো?

—বাবাগিরি।

—এই সার্কাসের মালিক?

—না, মালিক আমার বাবার বাবা, ঠাকুদ্দার বাবা। তোর অত খোঁজে কাজ কি রে ছোঁড়া?

—কাজ আছে। তার সঙ্গে দেখা করব। তুমি আমার সঙ্গে কি-রকম ব্যবহার করছ তাকে বলব। তুমি আমার গায়ের রং নিয়ে তামাশা করেছ।

—ও-ব্বা-বা! কি নাম তোর?

—টনি। ভালো চাও তো আমাকে সার্কাস দেখাবার ব্যবস্থা করো, নইলে একশো ছেলে জুটিয়ে তোমার বাবার বাবা ঠাকুদ্দার কাছে ঠিক নালিশ করব।

বড় বড় চোখ দুটো ঘটা করে কপালে তুলল একবার।—তুই-ই যে দেখি আমার বাবা রে, অ্যাঁ? পকেটে পয়সা নেই বুঝি?

মাথা নাড়লাম। নেই।

—আর সার্কাস দেখার সখ আছে?

মাথা নাড়লাম। আছে।

—সেই জন্যে মাথায় শয়তানি গিসগিস করছে?

আমি মাথা নাড়লাম। করছে।

—আচ্ছা বাবা, রাত্তিরের শো-তে আসিস, গেটে বলিস ফ্র্যাংকি বোমারের কাছে যাব, তাহলেই তোকে জামাই-আদরে ভিতরে নিয়ে যাবে।

উত্তেজনা বুকে চেপে রাত্তিরের শো পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। শো দেখার পর চতুর্গুণ আনন্দ। মানুষ এতরকমের কসরৎও দেখাতে পারে ধারণা করা যায় না। ওরা যেন সব স্বপ্নের দেশের মেয়ে-পুরুষ। যা করতে চায় তাই করতে পারে। কসরৎ দেখে মুগ্ধ, ওদিকে গুরুগম্ভীর ফ্র্যাংকি বোমার সং সেজে সারাক্ষণ যা করে বেড়াচ্ছে—সকলে হেসে কুটিপাটি। ও জোকার। আরো তিন-চারটে জোকার আছে, কিন্তু ওর কাছে কেউ লাগে না। একের পর এক ভণ্ডুল বাধিয়েই চলেছে।

শেষে একটা মেয়ের চারিদিকে গা-ঘেঁষে বোর্ডে ছোরা বেঁধানোর পর সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতেই কোথা থেকে নতুন পোশাকে ছুটে এসে বোর্ডে দাঁড়াল। খেলা যে দেখাচ্ছিল সে ধাঁ করে একটা ছোরা ছুঁড়ে মারতেই বোমারের মাথা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়। সকলে বিষম চমকে উঠল, বিকট একটা আর্তনাদ করে বোমার মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখা গেল একটা নকল মাথা বোর্ডে বিঁধে আছে, আর অক্ষত বোমার মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

অনেক রাতে ঘরে ফিরতেই গোমেজের হাতে ঠেঙানি। ওটুকু প্রাপ্য হিসেবেই ধরে নিয়েছি। সমস্ত রাত ধরে কেবল সার্কাসেরই স্বপ্ন। সকালে ঘুম ভাঙাব পরেও। কেবলই মনে হতে লাগল, ওই অতবড় দলটা সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে... আমিও যদি ওদের সঙ্গে একজন হতাম!

শুধু একজন কেন, একদিন এই দলের নায়ক হব বলেই হয়তো চিন্তাটা নেশার মতো পেয়ে বসেছিল আমাকে। পর পর দু'তিন দিন দুপুরে বোমারের সঙ্গে দেখা করেছি। শুনেছি, যেখানেই ওরা যায়, মজুর আর চাকরের কাজ করার জন্য সাময়িক ভাবে কিছু স্থানীয় লোক নেওয়া হয়। আমি বোমারকে ধরে পড়লাম, যে-ক'দিন তারা আছে এখানে আমাকেও একটা কাজ দেওয়া হোক।

বোমার আমার একখানা হাত বগলদাবা করে নিয়ে চলল কোথায়। খানিকটা গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়াল। গজ তিরিশেক দূরের ছোট্ট একটা শৌখিন তাঁবু দেখিয়ে বলল, ওখানে আমাদের বাবার বাবা ঠাকুদ্দার বাবা আছে—তাকে গিয়ে বল, মেজাজে থাকলে কাজ পেয়ে যেতে পারিস।

বোমার সেখান থেকে কেটে পড়ল। পায়ে পায়ে তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে রুক্ষ চেহারার একটা মানুষ দিনে-দুপুরেই বসে বসে মদ গিলছে। দেখে একটুও ভরসা হল না। তবু ঈশ্বরের নাম নিয়ে ঢুকে পড়লাম। কোণের ক্যাম্প-খাটে বছর দশেকের একটা ফুটফুটে মেয়ে বসে আছে। এই লোকটারই

মেয়ে হবে। আমাকে দেখেই ভয়ে ভয়ে বাপের দিকে তাকাল। তারপর ইশারায় আমাকে চলে যেতে বলল।

আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। চাপা হুঙ্কার শুনে সচকিত।

--কি চাই ?

—কাজ।

লোকটা ভুরু কুঁচকে দেখল খানিক। তারপর টেবিল থেকে মদের বোতলটা নিয়ে ছুঁড়ে মারার জন্য মাথার ওপর তুলল।

আমি ছুট।

শুনে বোমার মন্তব্য করল, তুই একটা গাধা, দাঁড়িয়ে মারটা খেতে পারলে কাজ পেতিস—আমরাও মার খাই, তারপর কিছু না কিছু পাই।

নিজের নির্বুদ্ধিতায় মনটা খারাপ হয়ে গেল, আবার ওই মালিকের ওপর বেজায় রাগও হল। যাই হোক, কাজের আশায় জলাঞ্জলি। একদিন পরের কথা। দিনটা মেঘলা ছিল। পকেটে গোটা তিনেক আপেল আর বড় গুলতিটা নিয়ে (ওটাই সব থেকে প্রিয় বস্তু আমার তখন) আমি সামনের জঙ্গলে ঢুকলাম। দুপুরে ওটাই আমার অবকাশ যাপনের জায়গা।—একটা বড় গাছ বেছে নিয়ে উঁচু ডালে উঠে বসলাম। আরাম করে ঠেস দেবার মতো পিছনেও একটা মোটা ডাল আছে।

ওখানে বসার উদ্দেশ্য বুনো মুরগি মারা। ওগুলোর সঙ্গে ছোটাছুটি করে পারা যায় না। মানুষের সাড়া পেলেই কঁ-কঁ শব্দে ছুটে ঝোপের মধ্যে সেঁধোয়।

বসে আপেল চিবুচ্ছি। হঠাৎ শরীরের সমস্ত স্নায়ু টান-টান আমার। বন্দুক হাতে চারদিক দেখতে দেখতে যে-লোকটা আসছে তাকে আমি চিনি সার্কাস পার্টির মালিক মারভিন জেনট্রি। তক্ষুনি গুলতি বাগিয়ে ধরলাম আমি। ওর মাথায় বড়সড় একটা সুপুরির দানা গজিয়ে দিতে পারলে সেদিনের অপমানের শোধবোধ হবে।

লোকটা হঠাৎ কি যেন দেখল। বন্দুক বাগিয়ে একদিকে চোখ

রেখে পায়ে পায়ে এগোতে লাগল।...হাত পঁচিশেক দূরে মস্ত সাপ একটা, কুলোর মতো ফণা তুলে শত্রু দেখছে।

মারভিন জেনট্রি বন্দুকের নিশানা করার আগেই সাঁ করে হাতের গুলতি ছুটল আমার। পাথরের টুকরোটা রীতিমত জোরে ঠক করে ফণার ওপর লাগল। ফণাটা মাটিতে আছড়ে পড়ল। চকিতে পাঁচ সাত হাত সরে গিয়ে সাহেব বিমূঢ় মুখে এদিক-ওদিক তাকাল একবার। ঘা-খাওয়া ক্রুদ্ধ সাপ এবারে হাত পনেরো দূর থেকে ফোঁস করে মাথা তুলল আবার। সাহেবের গুলির আগে আবার আমার গুলতি ছুটল। পাথরের টুকরো এবারে আরো জোরে ফণার ওপর ঘা বসিয়েছে। এবারেও সেই একই প্রহসন। ওটা ফণা নামাতেই বিমূঢ় সাহেব তিন লাফে আমার গাছটার কাছে এসে দাঁড়াল। একটু বাদেই সে আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সাপটা সেখানে এসে মাথা তুলল। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের গুলী ছুটল।

ওটাকে খতম করে সে ঘুরে চারদিক নিরীক্ষণ করল, তারপর ওপরের দিকে। আমি ধরা পড়ে গেলাম। কিন্তু লোকটা করতে যাচ্ছে কি, বন্দুকের নলটা আমার দিকে উঁচিয়ে ধরল কেন? ভয়ে ওই উঁচু ডাল থেকেই মাটিতে লাফিযে পড়লাম আমি। বিলক্ষণ চোট পেলাম। উঠে দাঁড়াতে পারলাম না। বন্দুকের নল আবার আমার দিকে ঘুরল। ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমি দু'চোখ বুজে ফেললাম। মিনিট খানেক কেটে গেল। কোনো রকম অঘটন ঘটল না দেখে ভয়ে ভয়ে তাকালাম আবার। বন্দুক নামিয়েছে। পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে সাহেব আমাকে দেখছে। উঠে চোঁ-চাঁ দৌড় দেবার ইচ্ছা। কিন্তু দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের হাড়ে খচ খচ করতে লাগল। দৌড়নো অসম্ভব। তাছাড়া লোকটার খর চোখের চাউনির মধ্যেও কি একটা বিশেষত্ব আছে। লোককে বশ বা অবশ করার একটা শক্তি আছে যেন ওই চোখে।

আরো একটু এগিয়ে এলো।—সাপের গায়ে গুলতির পাথর মেরে আমাকে বিপদে ফেলেছিলি কেন?

ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ বিপদে ফেলার জন্য মারিনি।

ভদ্রলোক সরোষে চেয়ে রইল আরো খানিক।—তোকে কোথাও দেখেছি···কোথায়?

—আজ্ঞে পরশু আপনার তাঁবুতে···কাজ চাইতে গেছলাম।

—কাজ দিয়েছি?

—আজ্ঞে না।

—কি বলেছি?

—কিছু না।···টেবিল থেকে একটা বোতল ছুঁড়ে মারতে গেছলেন।

—হুঁ। কি নাম তোর?

—টনি। টনি কার্টার।

ইশারায় অনুসরণ করতে বলে মার্ভিন জেনট্রি ফিরে চলল। নতুন আশা আর নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আমি পিছনে চললাম। জঙ্গলের বাইয়ে একটা জিপ দাঁড়িয়ে। জেনট্রি বন্দুকটা পিছনে রাখল। তার-পর পিছনের সীট থেকে বোতল বার করে ঢক ঢক করে খানিকটা কাঁচা মদ গলায় ঢালল। তারপর চালকের আসন নিয়ে ইশারায় আমাকে পাশে বসতে বলল।

আমার জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা সেটা।

পরে বেয়ারের মুখে শুনেছি আমার গুলতির টিপ দেখেই খাম-খেয়ালী মনিবের সুনজর মিলেছে। গোমেজ আপত্তি করেনি এখানকার স্থানীয় মজুর বা চাকরের দৈনিক নগদ তলব মেলে। করকরে নগদ টাকা পেয়ে গোমেজ খুশী। শুয়ে বসে আর বাউণ্ডুলেগিরি না করে বাড়ির অন্ন না ধ্বংসে দুটো পয়সা যদি ঘরে আনতে পারে আনুক। খুব ভোরে চলে যাই, ফিরি সেই রাত দুপুরে, অনেক দিন আবার ফিরিও না। দু'বেলার খাওয়াটা ওখান থেকেই জোটে—গোমেজ আপত্তি করবে কেন?

দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে গেল। তল্পি-তল্পা গোটানো শুরু হল। চৌদ্দ বছরের মধ্যে এই দুটো মাসই আনন্দে কেটেছে আমার।

আবার সেই একঘেয়ে জীবনের মধ্যে ফেরার কথা মনে হলেও মেজাজ বিগড়োয়। আমি যাতে এই প্রতিষ্ঠানের একজন হতে পারি, সে-চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি। টানা দু'মাস ছায়ার মতো খ্যাপা মনিবের সঙ্গে লেগে থেকেছি, মুখের হুকুম খসার আগেই তা পালন করেছি। গা-হাত-পা টিপে দিয়ে তোয়াজ তোষামোদ করেছি। অনেক বাড়তি খেটেছি। সেই সঙ্গে পাকা খেলোয়াড়দেরও মন জুগিয়ে চলেছি। যদি তারা কেউ আমার জন্য মনিবের কাছে একটু আধটু সুপারিশ করে।

কপাল ঠুকে নিজেই শেষে মনিবের কাছে আবেদন পেশ করেছি। মাইনেপত্র দিন বা না দিন আমি তার দলে থাকতে চাই, দলের একজন হতে চাই।

আমার দিকে চেয়ে জেনট্রি ভবল একটু।—এখানে তোর কে আছে?

মাথা নেড়ে জানালাম, কেউ না।

—বাবা মা কেউ না?

আবার মাথা নাড়লাম। কেউ না।

—এখানে থাকিস কোথায়?

—গীর্জেয়।

আবেদন মঞ্জুর। উড়তে উড়তে ঘরের দিকে ছুটলাম। দুনিয়ার সব থেকে সেরা ভাগ্যবান বুঝি আমি। টাকা-পয়সা এখন পাই বা না পাই কিছু যায় আসে না। আপাতত খাওয়া-পরা জুটলেই হল। একদিন না একদিন জেনট্রির দলের সব থেকে সেরা খেলোয়াড় আমি হবং। মাথায় তখন টাকার বৃষ্টি হবে।

গোমেজকে সুখবরটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা কি-রকম যেন হয়ে গেল। ঘোরালো চোখে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর আচমকা গালে এক বিষম চড়। সেই চড়ের চোটে চোখে অন্ধকার। দাঁতে দাঁত ঘষে ও বলে উঠল, নেমকহারাম বেইমান! জন্মের থেকে এত করেছি তার বদলে এই কৃতজ্ঞতা তোর? পিঠের ওপর আবার কষে লাগাল দু'ঘা।—আর এ কথা বলবি কোনোদিন? [illegible] বল

নইলে মেরেই ফেলব আজ তোকে। প্রহারের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই প্রতিশ্রুতি দিলাম, আর কক্ষনো বলব না, আর কক্ষনো কোথাও যেতে চাইব না।

কি করব না করব আমিই জানি। আমাকে আটকানো আর কারো কম্ম নয়।···কিন্তু সেই রাতেই একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল আমার। মারধোর করার পর থেকে গোমেজ একটি কথাও বলেনি আমার সঙ্গে। খেয়ে দেয়ে যে-যার শুয়ে পড়েছি। তখন বিছানায় গা ঠেকানো মাত্র ঘুম হত। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কি-রকম একটা স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে পাশে বসে কেউ একজন আমার গায়ে পিঠে হাত বুলোচ্ছে আর ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ছাড়ছে। গোমেজ ছাড়া আর কে? মনে হল কাঁদছেও। এমন তাজ্জব ব্যাপার ভাবতে পারি না। ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। আমার মন বলল ওই গোমেজই আমার বাবা।

এরপর দু'দিন ও আমাকে চোখে চোখে রাখল। ও যতক্ষণ থাকে আমি ঘর ছেড়ে বেরোই না। আবার ফিরে এসেও দেখে আমি ঘরেই বসে আছি। সে নিশ্চিন্ত হল। খানিকটা দূরের এক প্রতিবেশী ছেলের সাইকেল নিয়ে আমি যে তার অনুপস্থিতির ফাঁকে কাজ সেরে আসি জানবে কি করে?

পাঁচ দিনের দিন দলের সঙ্গে হাওয়া আমি। রাত্রিতে গোমেজের যখন সন্দেহ হবে তখন আমি অনেক দূরে। নতুন জগৎ আর নতুন জীবনে পদার্পণ আমার। আনন্দে আর রোমাঞ্চে ভরপুর আমি। তার ওপর দিয়ে গোমেজের বিষণ্ন মুখখানা থেকে থেকে চোখে ভাসছে।

॥ তিন ॥

সব থেকে বেশি খাতির হয়ে গেছল ফ্র্যাংকি বোমারের সঙ্গে। রাতে তার কাছেই শুতাম। কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল, যে সুশ্রী মেয়েটাকে বোর্ডে দাঁড় করিয়ে চারদিকে ছোরা বেঁধা হয়, বোমার তার

প্রেমে একেবারে হাবুডুবু। এই নিয়ে সমপর্যায়ের বন্ধুরা ঠাট্টা-মশকরা করে ওর সঙ্গে। রাতে শুয়ে বোমার নিজেই কত কথা বলত। আমি একেবারে ছেলেমানুষ, বয়সে ওর থেকে দশ-এগারো বছরের ছোট, সেটা ওর খেয়াল থাকত না। প্রেমজ্বরের ছটফটানি শুরু হলে মানুষ ঘরের দেওয়ালের সঙ্গেও কথা বলে বোধহয়, আমি তো তাব থেকে ভালো। তার ওপর বয়েস যা-ই হোক, অকালপক্কও বটে। তিন মাস না যেতে আমার কত দিকে চোখ খুলেছে ঠিক নেই।

...সেই রাতে একটু মদ গেলার ফলে বোমারের হা-হুতাশ বেড়ে গেছল। মারজোরি দুটো ভালো কথা বলা দূরে থাক, ও কাছে যেতে নাকি একটা ছোট বাঁশ নিয়ে তাড়া করেছিল। দোষের মধ্যে বোমার তাকে একটা চুমু খেতে চেয়েছিল শুধু। আপত্তি না করার দরুন সাহসে ভর করে কাছে এগিয়েছিল। তার পরেই ওই কাণ্ড, অর্থাৎ বাঁশ নিয়ে তাড়া।

বোমারের জন্য আমার দুঃখ হল, আরো বেশি দুঃখ হল কারণ বোমার চেষ্টা করলেই খেলোয়াড়রা আমাকে একটু আধটু খেলা শেখাতে পারে। সকলের সঙ্গেই খুব খাতির তার। ওই এক দেমাকী মারজোরি ছাড়া। কিন্তু বোমারের ভিতরে যদি সর্বদাই এ-রকম হা-হুতাশ চলতে থাকে তাহলে তাকে দিয়ে আর কি হতে পারে? চট করে মনে হল, এই ব্যাপারে যদি আমার মারফত ওর একটু উপকার হয় তাহলে ওর কৃতজ্ঞতা উছলে উঠবে, তখন যে আবদার করব তাই শুনবে।

এরই মধ্যে একটু আধটু পছন্দ আমাকেও সকলেই করে। কারণ, মনিবের কাছ থেকে ছাড়া পেলে আমি খেলোয়াড়দেরও ফাই-ফরমাশ খাটি। মতলব ঠিক করে পরদিন দুপুরের নিরিবিলিতে আমি মারজোরির কাছে গিয়ে হাজির। বললাম, কাল সমস্ত রাত ধরে বোমার তোমার জন্য হাপুস-হাপুস কেঁদেছে। ও তো খুব ভালো লোক, এ-রকম কষ্ট না দিয়ে ওকে তুমি একটু একটু ভালবাসো না?...যদি বাসো তাহলে তুমি যখন যা বলবে আমি তাই করে দেব।

মারজোরি বড় বড় চোখ করে তাকালো আমার দিকে। কিন্তু তখন কি ওর বজ্জাতি বুঝেছি। মুখখানা বরং আশাপ্রদ মনে হয়েছে।—ভালবাসবে?

ও মাথা নেড়েছে, বাসবে।

ছুটে গিয়ে বোমারকে সুখবরটা দিয়েছি। সুখবরটা এত অপ্রত্যাশিত যে ও হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হাতে-নাতে দৌত্য-কর্মের ফল পেলাম। মনিবের তলব শুনে হাজির হতেই জেনট্রি জিজ্ঞাসা করল, মারজোরিকে কি বলেছিস?

আমি ভ্যাবাচাকা।

দেয়াল থেকে চাবুকটা টেনে নিয়ে সপাসপ বসিয়ে দিল কয়েক ঘা। গায়ের চামড়া ফেটে জ্বলে যাবার দাখিল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তার দশ বছরের মেয়েও সভয়ে দেখছে। আরও ক' ঘা পড়ত ঠিক নেই। কোথা থেকে বোমার ছুটে এসে আমাকে আগলালো। ফলে তার পিঠেও শপাং করে পড়ল এক ঘা।

ইতিমধ্যে মনিবের বকুনি খেয়েছি অনেক। প্রহার এই প্রথম। আমার কান্না পেয়ে গেল, কিন্তু শক্ত হয়ে সেটাকে ঠেকালাম। মনিবের জন্যে আমি যত করি তেমন আর কেউ না। আর সে কিনা প্রায় বিনা দোষে এভাবে মারল আমাকে!

পরে দেখলাম, তিনটে মাস যে মার খাইনি সেটাই আমার ভাগ্য। কারণ মেজাজ চড়লে তার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। নিজের ওই একরত্তি মেয়েকেই কত সময় মেরে বসে। একদিন পাশের ঘরে বসে মদ গিলছিল, মেয়ে এদিকের ঘরে বড় একটা কাচের জার ফেলে ভাঙল। আধঘণ্টা আগেই মেয়েকে ওটা ধরতে নিষেধ করেছিল। একে অবাধ্যতা তার ওপর নেশার তাল কেটেছে। চাবুক নিয়ে ঘরে হাজির। জারটা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমি বিপদের গন্ধ পেয়েছি। সারাকে পালাতে বলে আমি তাড়াতাড়ি ভাঙা কাচ কুড়োতে লেগে গেলাম।

আমাকে একলা দেখে মনিব ধরে নিল আমিই ভেঙেছি ওটা। ব্যস, শপাং করে পিঠে পড়ল এক ঘা।

মেজাজ বিগড়ে থাকলে পান থেকে চুন খসলেও প্রহার। আর মেজাজও বিগড়ে থাকত প্রায় সর্বদাই। খাঁচায় পোরা বাঘ-সিংহগুলোর মতোই মেজাজ সর্বক্ষণ। অতএব আমার দুর্ভাগ্য খণ্ডাবে কে। কিন্তু আশ্চর্য, আমার মতো ছেলের এই মারধোর সয়ে যাবার কথা। গোমেজের হাতেও আমি কম মার খেতাম না। কিন্তু জেনট্রি মারলেই একটা অদ্ভুত ধরনের অভিমান আমাকে পেয়ে বসত। একটু স্নেহ-মমতা দিয়ে লোকটা আমাকে কিনে রাখতে পারত। কিন্তু এই লোকের কাছ থেকে সেটুকু দুরাশা। একমাত্র বাঘ-সিংহ জন্তু-জানোয়ারগুলো ছাড়া দুনিয়ার আর কিছুই বোধহয় সে ভালবাসে না, আর কোনোকিছুর ওপর তার মায়া-মমতা নেই। তবু, শুধু এই লোকের কাছে মার খেলেই অভিমান হত আমার, অথচ রাগের মাথায় তার খেলোয়াড়রা কেউ চড়-চাপড় বসিয়ে দিলে সে-রকমটা হত না।

দু'মাসের মধ্যে মনিব সম্পর্কে যে চিত্রটা আমার মনের পটে আঁকা হয়ে গেল, অনুভূতির দিক থেকে তার মধ্যে অস্পষ্টতা কিছু থাকা স্বাভাবিক। কারণ বয়েস সবে তখন পনেরো আমার। পরিস্থিতির গুণে যত পাকাই হই, মগজের ধারণাশক্তি অন্যদের তুলনায় কিছুটা পরিমিত তো বটেই। ঠিক এই কারণেই সম্ভবত দলের অন্য লোকেরা মনিব সম্পর্কে যতটা নির্লিপ্ত, আমি ততটা নই। এই ক্ষ্যাপা মনিবের প্রতি আমার এক ধরনের আকর্ষণ ছিলই।

গোড়া থেকেই মনের তলায় একটা জিজ্ঞাসা দানা বেঁধে উঠেছিল। সারা জেনট্রির মা নেই কেন? বোমারকে একদিন জিজ্ঞাসা করতে সে গম্ভীর মুখে চোখ পিট পিট করে জবাব দিয়েছিল, সকলেরই যে সব থাকবে তার কি মানে? তোর কোথায় কে আছে?

কি কথায় কি কথা। তক্ষুনি মনে হয়েছিল এই জবাবের পিছনে রহস্য কিছু আছে। সারার মা মরে গিয়ে থাকলে বোমার এই গোছের

রসিকতা করত না। আর, মারভিন জেনট্রির ঘরের কোথাও মহিলার দু-একখানা ছবি অন্তত থাকত।

ওদের সঙ্গগুণেই আমি চট করে এতটা পেকে উঠেছিলাম। বোমারের মতোই চোখ পিট পিট করে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মরেছে না ভেগেছে?

বোমার সজোরে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল। —সাবাশ। তোর মানুষ হয়ে উঠতে আর বেশি দেরি নেই।

পরে সাগ্রহে সমাচার শুনেছি। সারার মা জেসি জেনট্রি মারভিনের জীবন থেকে সরেই গেছে। সারার তখন বছর পাঁচেক মাত্র বয়েস। কর্তা-গিন্নীতে খটাখটি লেগেই থাকত। তার প্রধান কারণ স্ত্রীর প্রতি মারভিনের উদাসীনতা। জন্তু-জানোয়ার অন্ত প্রাণ মারভিনের। একটা বাঘ বা একটা সিংহ বা একটা হাতি বা ঘোড়ার সামান্য অসুখ হলেও তার আহার-নিদ্রা ঘুচল। জীবটাকে চাঙ্গা করে না তোলা পর্যন্ত তার আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করার সময় নেই।

বেশির ভাগ এই নিয়েই বিবাদ স্ত্রীর সঙ্গে। বাইরে থেকে বোমার স্বকর্ণে একদিন জেসিকে বলতে শুনেছে, একটা সিংহী বা একটা বাঘিনী বিয়ে করলেই পারতে, মানুষের সমাজে ঢু দিতে গেছলে কেন?

জেসি জেনট্রি রূপসী ছিল। হুবহু মায়ের মুখের আদল পেয়েছে সারা। বোমার বলেছিল, সারার মুখের বয়স আরো বিশটা বছর বাড়িয়ে দিলেই জেসি জেনট্রি। যত তুচ্ছ কারণে দুজনের ঝগড়া লেগে যেত যে দলের অন্যদের কাছে সেটা বিস্ময়ের ব্যাপার।

টাকা-পয়সার ব্যাপারে মারভিন জেনট্রি বদান্য পুরুষ। জেসি প্রচুর হাত-খরচা পেত। সে-টাকা সে যে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কে জমাতো কারো ধারণা ছিল না। তাছাড়া ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা এড়ানোর জন্যেও মারভিন অনেক টাকা ব্যাঙ্কে স্ত্রীর নামে সরিয়ে রেখেছিল।

...স্বামী-স্ত্রীতে একদিন তুমুল হয়ে গেল। জেনট্রিদের সে-সময়ের

খাস চাকরের মুখে ঘটনাটা জানা গেছল। সেদিন কোনো শো ছিল না। বসে বসে সন্ধ্যা থেকেই মদ গিলছিল মারভিন। এই মদেই তার লিভার নষ্ট করেছে, এখন তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি নিজেই। যাই হোক, বারান্দায় বসে মারভিন মদ গিলছিল আর ঘরে বসে জেসি স্বামীর উদ্দেশ্যে একটানা কটূক্তি বর্ষণ করে চলেছিল।

মদ পেটে পড়লে এমনিতেই ভিন্ন মূর্তি মারভিনের। চাবুক হাতে উঠে এসে শপাশপ কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। জেসির কোমল অঙ্গে দাগড়া দাগড়া দাগ পড়ে গেল।

পরদিন অবশ্য নিজের ব্যবহারের দরুন অনুতপ্ত হতে দেখা গেছে মারভিনকে। স্ত্রীব কাছে নাকি রাতের ব্যবহারের দরুন ক্ষমাও চেয়েছিল। কিন্তু সেই থেকে টানা দু'মাস আশ্চর্য পরিবর্তন জেসি জেনট্রির। আর একটা দিনের জন্যেও ঝগড়া করেনি, একটি কটু কথা বলেনি। সর্বদা অনুগত মিষ্টি ব্যবহার। সকলেই জেনেছে, সুন্দরী মুখরা স্ত্রীকে মোক্ষম দাওয়াই দিয়ে ঢিট করেছে মারভিন জেনট্রি।

দু'মাস পরে। মারভিন জেনট্রি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কয়েকদিন বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা ছিল না। অসুস্থতার গোড়ার দিন থেকেই জেসি নিরুদ্দেশ। মারভিনের উদ্দেশে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। সেই চিঠিও মারভিনের টেবিলের ওপরে খোলা পড়েছিল। কে দেখল না দেখল তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। জেসি লিখেছে তোমার মতো পশুর সঙ্গে কোনো ভদ্রমহিলার জীবনযাপন সম্ভব নয়। সারাকেও নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সে তোমার বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, তাই ওকে বঞ্চিত করলাম না।

অসুখের দরুন মারভিন বিছানা থেকে উঠতে পারে না। সেই অবস্থায় খাঁচায় পোরা জানোয়াদের মতো ফুঁসেছে শুধু। কিন্তু ভালো হয়ে একটা দিনের জন্যেও স্ত্রীর খোঁজ করেনি। তার অ্যাকাউনটেন্টের মুখে বোমাররা শুনেছে ব্যাঙ্ক থেকে নিজের নামের সমস্ত টাকা-কড়ি তুলে নিয়ে জেসি পালিয়েছে।

স্ত্রীর খোঁজ করেনি বটে, কিন্তু সেই থেকে নাকি মারভিনের

মেজাজ সর্বদা আরো বেশি খাপ্পা। মদের মাত্রাও বেড়েছে। আর ওই একটি মাত্র ছোট মেয়ের প্রতিও অকরুণ। বোমার বলে, ছুঁড়িটা মায়ের মতো দেখতে বলেই কর্তা ওকে ভালো চোখে দেখে না।

ঘটনাটা শোনার পর থেকেই সারাকে দেখলে আমার কেমন মায়া হত। বাবা-মা কি জিনিস আমার জানা নেই। সারারও অনেকটা সেই অবস্থা। মা তো নেই-ই, বাবা থেকেও নেই। মায়া সম্ভবত সেই কারণেই। ফাঁক পেলে আমি ওর সঙ্গে খেলা করতাম, মনিব-কন্যা জ্ঞানে একটু-আধটু তোয়াজ-তোষামোদও করতাম। সেই কারণে মনিব-কন্যাটিও আমার প্রতি সদয়ই ছিল তখন।

বরাতটাই মন্দ আমার। পরের তিন বছরের মধ্যেও সার্কাস পার্টির ছোটখাট খেলোয়াড় হবার সুযোগ পেলাম না। দোষ খানিকটা আমারই। ভবিষ্যতের আশায় মনিবের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নিজেকে প্রায় অপরিহার্য করে তুলেছিলাম। চোখের দিকে তাকালে বুঝে নিতাম কি চাই। এ-রকম সেবা পাবার ফলেই আমাকে সে প্রত্যক্ষ-ভাবে সার্কাসের দলের সঙ্গে যুক্ত হতে দিল না। এই বয়সে তার খাস চাকর হিসেবে মাইনে অবশ্য বেশিই পেতাম। উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে খুশীই থাকার কথা। কিন্তু আমার হতাশা বাড়তেই থাকল। সারার মুখ দিয়ে দু'তিন দিন তার বাবার কাছে আবেদন পেশ করেছিলাম। সব কাজ করার পরেও যদি একটু খেলা শেখার সুযোগ পাই। শেষে একদিন দাবড়ানী খেয়ে মেয়েও আর বাপের কাছে সুপারিশ করতে রাজী হয়নি।

রিং-মাস্টারকে ধরে যা-ও একটু-আধটু শিখেছিলাম তাও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আমার গোপন শিক্ষানশিবির কথা মনিব জানত না। একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলাম। রিং-মাস্টার প্রচণ্ড ধমক খেল, আর আমি গোটা দুই চড়।

তখন বয়েস আমার আঠারো। আত্মসম্মানবোধ আগের থেকে বেড়েছে।...জীবনভোর এই গোলামী করব? এখান থেকে পালানোর

চিন্তাটা বার বার মনে আসতে লাগল। কিন্তু পালিয়ে কোন অনির্দিষ্টের বুকে ঝাঁপ দেব? তবু বোমারের কাছেই মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলেছিলাম একদিন।—কিছু যখন হবেই না, এখান থেকে সরে পড়লে কেমন হয়?

বোমার সন্ত্রস্ত।—মনিব জানতে পেলে চাবকে তোর পিঠের ছাল চামড়া তুলে নেবে—তুই তো বলতে গেলে কেনা লোক তার—

শুনে মেজাজটা আরো বিগড়ে গেল আমার।

এই সময়েই ছোটখাট একটা পরিবর্তনের সূচনা। যে লোকটা জন্তুদেব খাবার দেয় তার বয়েস হয়েছে। মাঝে মাঝে কাজের একটু-আধটু গাফিলতি হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়াবের সংখ্যা তো আর কম নয়। কিন্তু ও-গুলোর ব্যাপারে এতটুকু ত্রুটি বরদাস্ত করতে রাজী নয় মারভিন। ওদেব খাওয়া-দাওযার ব্যাপারে এতটুকু গলতি হয়েছে টের পেলে মারমুখী একেবারে। আড়ালে সকলে হাসি-ঠাট্টা করে, বলে, দরদ হবে না কেন, আগেব জন্মে জাত-ভাই ছিল যে।

মনিব হঠাৎ একদিন ডেকে পাঠাল আমাকে। গিয়ে দেখি সেখানে মাথা হেঁট করে আধ-বুড়ো বেনটন দাঁড়িয়ে। জন্তুদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার ভার তার ওপর। ওদিকে মনিবের গোমড়া মুখ। এক নজর তাকিয়েই বোঝা গেল এক পশলা হয়ে গেছে। আমার প্রতি হুকুম হল, আজ থেকে তুমি বেনটনকে সাহায্য করবে—কোন জানোয়ার কখন কি খায়, কতটা খায়, সব ভালো করে জেনে নেবে। এ কাজের জন্য বাড়তি টাকা পাবে।

বলা বাহুল্য, আমাব কিছুমাত্র আনন্দ হয়নি। আমি দলের শিল্পী হতে চেয়েছিলাম, চাকর নয়। বোমার অবশ্য বলেছে, তোর বরাত ভালো, বিশ্বাসী লোক ভিন্ন কর্তা কাউকে এ-দায়িত্ব দেয় না।

যাই হোক, মুখ বুজেই আমি বেনটনকে সাহায্য করতে লাগলাম। খুব খারাপও লাগল না। জীব মাত্রেরই জঠর-জ্বালার একটা নতুন দিক দেখতে পেলাম। সময়ে খাবার দিতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে জানোয়ারগুলো রীতিমতো চেঁচামেচি করতে থাকে। মারভিনের

আদরের শিম্পাঞ্জী বিল তো ঠাস করে গালে একটা চড়ই বসিয়ে দিল সেদিন। বিল অনেক রকমের খেলা দেখায়। সিগারেট টানতে টানতে একচাকার সাইকেল চালায়, ট্রেন চালায়, দর্শকদের সঙ্গে নানা রকম রসিকতা করে। ও নিজের কদর জানে, আমার থেকে অন্তত ওর দাম বেশি। দোষের মধ্যে ওর প্রাতরাশের সঙ্গে সেদিন আমি কলা দিতে ভুলে গেছলাম। কর্তা সামনে ছিল, বলল, বেশ হয়েছে।

আমাকে পেয়ে বেনটন আরো কাজে ঢিলে দিতে লাগল। ফলে আমার ওপর চাপ বাড়তে লাগল। হাতি-ঘোড়ার খাবার দেবার সময় ও কাছেও থাকে না। বাঘ-সিংহের খাবার শুধু নিজের হাতে দেয়। তার আসল কারণ, কর্তা প্রায়ই তখন উপস্থিত থাকে।

এই সময় থেকেই মালিকের চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়েছে। ওই হিংস্র জানোয়ারগুলোর সঙ্গে তার যেন নিবিড় বন্ধুত্ব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আমি তাকে বাঘ-সিংহগুলোর সঙ্গে গল্প-সল্প করতে দেখেছি। ওদের সঙ্গে কথা বলে, গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। খাঁচার ফাঁক দিয়ে কপালে কপাল ঘষে সোহাগ করে। কেবল ওদের নিয়ে যখন রিং-এ খেলা দেখায় তখন অন্য রকম দাপট তার। একটু অবাধ্য হলে তখন শপাং করে চাবুক বসিয়ে দেয়। বাঘ-সিংহের খেলা দেখানোর আইটেমটা কর্তার অর্থাৎ মারভিন জেনট্রির নিজের।

আমি দিবাস্বপ্ন দেখতাম, স্নেহপরবশ হয়ে (যে বস্তুর ছিটেফোঁটাও তার মধ্যে কেউ দেখেনি) ভদ্রলোক হয়তো একদিন এই সেরা উত্তেজনার খেলাটিই আমাকে শেখাবে। স্নেহ মানুষের বেলায় নেই, কিন্তু জানোয়ারগুলোর প্রতি তো আছে। সেটা যে মানুষের বেলাতেও ঘুরবে না একদিন, কে বলতে পারে।

নতুন কাজের ছ'মাসের মধ্যে একটা অঘটন ঘটল। আমি মনে মনে এমন আশাও করতাম, মারভিন যদি ছোটখাট কোনোরকম বিপদে পড়ে আর আমি যদি তার থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারি, তবে হয়তো দিন ফিরবে আমার। তার বদলে অঘটনের ঝাপটাটা নিজের ওপর দিয়েই গেল। বাঘ-সিংহের খাবার দেবার সময় ছ'মাস বেনটনের সাগরেদি

করে আমারও ভয়-ডর কমে গেছল। খাবার দেয় বলে তো বাঘগুলো যেন পোষা বেড়াল বেনটনের। আর আমি তার সাহায্যকারী, ইদানীং অনেক সময় বেনটন সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি ওদের খাবার দিই —অতএব আমিও ওদের প্রিয়পাত্র নই কেন? বেনটনের উপস্থিতিতে মাঝে মাঝে খাঁচা ঘেঁষে দাঁড়াতে লাগলাম। তাতেও বাঘগুলোর তাপ উত্তাপ না দেখে সাহস বাড়ল। একদিন সব থেকে নিরীহ গোছের বাঘ যেটা মনে হত, সেটার গায়ে একটু হাত বুলোতে গেলাম, যুগপৎ হুঙ্কার এবং থাবার ঘা। কপাল থেকে গাল পর্যন্ত সমাংস খানিকটা চামড়া ঝুলে পড়ল। আর একটু হলে ও-দিকের চোখসুদ্ধু টেনে বার করে নিত।

তারপর দু'মাস হাসপাতালে আমি। মারভিনের একটু স্নেহ পাওয়া দূরের কথা, কর্তা যেন আরো বিরূপ। আমাকে হাসপাতালে দেখতে এসেও মেজাজ তিরিক্ষি।—বেশ হয়েছে, ওরা তোর ইয়ার্কির পাত্র, কেমন?

আমার ভয় ধরেছিল, এর পর আমাকে দল থেকেই না তাড়িয়ে দেয়। তার পনেরো বছরের মেয়ে সারা জেনট্রির মুখে বরং একটু দরদের আভাস দেখেছিলাম। ও বলেছে, তোমার ওপর বাবা ভয়ানক রেগে গেছে, আর বোধ হয় তোমাকে বাঘ-সিংহর দিকে ঘেঁষতে দেবে না।

অর্থাৎ আবার যে-কে সেই ঘরের চাকর। অসহায় অবস্থা বলেই আত্মাভিমানে ফুঁশে উঠেছিলাম সেদিন। বলেই ফেলেছিলাম, তাহলে আমি কাজ ছেড়ে দেব।

মুখে সচকিত ভাব দেখেছিলাম মেয়েটার। সর্বনাশ! কাউকে বোলো না, পালাতে যদি হয় চুপি চুপি পালাবে। বাবা জানতে পারলে আগে চাবুকের চোটে আধমরা করে তারপর তাড়াবে তোমাকে। বোমারের মুখে শুনেছি একমাত্র তুমিই বাবার কেনা লোক।

অর্থাৎ আমি ক্রীতদাস। ভিতরের যন্ত্রণায় ক্ষতমুখ দিয়ে রক্ত বেরুনোর দাখিল।

এই মেয়েও বাপকে কোন চোখে দেখে সেদিনই বোঝা গেছল।

সে পরামর্শ দিয়েছিল, তুমি বরং বোমারকে একটু বলে কয়ে রাখো—সে বললে বাবা ঠাণ্ডা থাকবে—তার কথা তো বাবা ফেলতে পারে না।

চার বছরের মধ্যে এটা নতুন খবর আমার কাছে। বোমারের এই গোছের প্রতিপত্তির নজির কখনো দেখিনি। বরং তাকেও মালিকের কাছে অনেক সময় বিষম বকুনি খেতে দেখেছি।

—বোমারের কথা তোমার বাবা শোনে?

—শুনবে না। সে এক সময় বাবার কত কাজ করে দিয়েছে। ও সকলকে হাসায় বলে ওকে তো বিশ্বাস করে সকলেই, তাতেই বাবার সুবিধে। গলা খাটো করে বলেছে, কাউকে বোলে না যেন, মায়ের পিছনে বাবা তো বোমারকেই লাগিয়ে রেখেছিল, মা কখন কোথায় যায়, কি করে, কত টাকা ওড়ায়, কার সঙ্গে মেশে এ-সব খবর তো বোমারই বাবাকে বলে দিত—আমি বড় হতে মদের ঝোঁকে বাবা নিজেই আমাকে একদিন বলেছে এ-সব।...তাছাড়া আমাকে তো সকলের থেকে বেশি ভালবাসে বোমার—তাই বিশ্বাস করে আমাকে বলেছে, জানে তো আমার পেট থেকে কথা বেরোয় না। এই তো, মাত্র সাত-আটদিন আগে শুনলাম সব।

অর্থাৎ আমি যখন হাসপাতালে। পেটে কথা কেমন থাকে সে তো দেখাই যাচ্ছে। ও যে বড় হয়েছে এই গর্বও আছে। কিন্তু আমি অবাক অন্য কারণে। বোমার আমার সঙ্গে সমবয়সীর মতো মেশে, ইয়ারকি-ফাজলামো করে, মনের কথা বলে, অন্তরঙ্গ অবকাশে তার প্রেমিকা মারজোরির উদ্দেশ্যে গাল পাড়ে আর গরম গরম নিশ্বাস ছাড়ে। বলে, চারদিকে ছুরি বসানোর খেলা দেখিয়ে দেখিয়ে ছুঁড়িটা ছুরির ফলার মতো হয়ে গেছে একেবারে। এখনো ওকে বাগে আনার জল্পনা-কল্পনা চলে আমাদের। এই বোমার কর্তার বউ পালানোর গল্প করেছে—কিন্তু নিজের ওই ভূমিকার সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি।

বোমারের ওপরেও প্রচণ্ড অভিমান হল আমার। আমার আকাঙ্ক্ষার খবর রাখে অথচ আমার জন্য কর্তার কাছে কোনোদিন

একটু সুপারিশ করল না! ফলে বিরস মুখে বলে উঠলাম, বোমার কি এমন যোগ্য লোক, তোমার মা-কে কি আগলে রাখতে পেরেছে? দিব্যি তো পালিয়েছে—

—বা রে বাবার যে তখন খুব অসুখ, ও তো তখন বাবাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তারপরেই ঈষৎ উৎসাহে জানান দিল, আসলে মা পালাতে পেরেছে বলে ও খুশী হয়েছিল, বুঝলে? আমাকে সে-কথাও বলেছে। পালাতে না পারলে রাগের মুখে বা নেশার ঝোঁকে বাবা ঠিক একদিন মা-কে গুলী করে বসত।

মনিব-কন্যার সঙ্গে এই গোছের কথাবার্তার সুযোগ বড় মেলে না। আঠেরো বছর মাত্র বয়েস আমার, ছেলেমানুষ তো বটে। আমার জীবনে বাপ-মা নেই, আর ওর থেকেও নেই। তাই জানার লোভ হল।—মা চলে যেতে তোমার দুঃখ হয়নি?

—খুব হয়েছে।...কিন্তু মা কি করবে, এই লোকের সঙ্গে কেউ থাকতে পারে।

বাপের প্রতি এমন বীতশ্রদ্ধ ভাব আর কোনোদিন দেখিনি।

চিরদিনের মতো মুখে এই ক্ষতচিহ্ন নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরেছি। আয়নায় এ-মুখ দেখে নিজেরই কান্না পেত। আমার কাজ ছেঁটে দেওয়া হয়নি—আগের মতোই বেনটনকে সাহায্য করছি। মনিব কেবল এক দফা শাসিয়েছে আমাকে, ওদের নিয়ে ফের ইয়ার্কি করতে যাবি তো খাঁচা খুলে একেবারে ভিতরে ফেলে দেব। শাসানোর দরকার ছিল না। প্রাণের মায়া যথেষ্টই আছে আমার।

হাসপাতাল থেকে ফিরেই বোমারকে চেপে ধরলাম একদিন। মনিব তাকে তলায় তলায় খাতির করে একটু, অথচ আমাকে সে সামান্য সাহায্যও করল না। এই জন্যেই হাসপাতালে ওর সঙ্গে ভালো করে কথা পর্যন্ত বলিনি আমি।

চোখ পিট পিট করে গম্ভীর মুখে বোমার খানিক দেখেছে আমাকে।—মেয়েটা তোর কাছে সব ফাঁস করে দিয়েছে?

—করেছে তো।

বড় নিশ্বাস ফেলে বোমার মন্তব্য করেছে, ওই ছুঁড়িও পালাবে একদিন—ঠিক মায়ের মতো চেহারা, মায়ের মতো মতি-গতি।

—চুলোয় যাক্। তুমি আমার জন্য কিছু করছ না কেন?

—কর্তার বাঘ-বশ করা চাবুকখানা দেখেছিস?

ঠিক না বুঝে মাথা নাড়লাম।

—বউ পালানোর পর থেকে কারো ওপর কারো টান দেখলে কর্তার ওই রকম মেজাজ হয়। কেবল বাঘিনী যখন বাঘের গা-পিঠ চেটে সোহাগ জানায় সেটা শুধু বরদাস্ত হয়, ছচোখ ভরে দেখে। এখানে কারো জন্যে কেউ কিছু বলতে গেলে উল্টে তার ক্ষতি হয়। মালিক তার ক্ষতি করে মজা দেখে, যাকে বলে রি-অ্যাকশন দেখে।

অতএব আশায় সেখানেই জলাঞ্জলি।

একঘেয়ে ভাবে আবার একটা বছর কেটে গেল। আমার বয়েস উনিশ। মালিকের মেয়ে সারার ষোল। আমার চোখের সামনে সোনালী ভবিষ্যতের বর্ণ প্রায় নিষ্প্রভ। এর মধ্যে দূর থেকে শুধু ওই মেয়েটাকে দেখতে ভালো লাগে। তাও দূর থেকে দেখি। ও টের না পায় এমন করে দেখি। নিজের পরিবর্তন কতটা হয়েছে জানি না—কিন্তু মেয়েটার মধ্যে একটা নতুন ছাঁদ চোখে পড়ে। ওর শরীরটা বদলাচ্ছে। দেখতে ইচ্ছে করে। দেখতে লোভ হয়। না, ওকে নিয়ে কোনো অসম্ভব স্বপ্নের জাল আমি বুনিনি। দেখতে ভালো লাগে। শুধু দেখি।

…এটুকুর অপরাধেই মালিকের কোপের মুখে পড়ে গেলাম একদিন। আর এই বিশ্বাসঘাতক বোমারটার জন্যেই মাটির নীচে ঢুকে যেতে ইচ্ছে করল আমার। এখন আমরা বাইরের ক্যাম্পে। বছরের মধ্যে কম করে ছ'মাস ক্যাম্পের জীবন আমাদের। এক মেঘলা দিনে উঁচু গাছের ডালে দোলনা বেঁধে সারা জেনট্রি দোল খাচ্ছে। ওই উঁচু গাছের ডালে দোলনা আমিই বেঁধে দিয়েছি। তারপর পিছনের দিকে প্রায় পনেরো গজ সরে এসে নির্নিমেষ নয়নে ওর দোল খাওয়া দেখছি। যত দেখছি তত ভালো লাগছে।

ও কেও বোধহয় দোলার নেশায় পেয়েছে। মেয়েটার ভয়-ডর কম। দোলনাটা একবার ওদিকের আকাশে উঠছে, একবার এদিকের। গায়ের জামাটা উঠে উঠে যাচ্ছে। ইজের-পরা পিছনের গা-পিঠ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। পুষ্ট দুটো পা, পুষ্ট নরম দেহ একখানা। আমাকেও দেখার নেশায় পেয়েছে। একটু দূর দিয়ে ঘুরে সামনের দিকে এসে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম। তারপর দেখার আনন্দে আরো বিভোর!

হঠাৎ কানে হ্যাঁচকা টান একটা। ঘুরে দাঁড়াতেই দু'চোখ ছানাবড়া। একেবারে যমের মুখে। সারার বাবা মারভিন জেনট্রি। কান ধরেই হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল আমাকে দুলতে দুলতেই সারা দৃশ্যটা দেখল। দূরে দূরে ছেলেরা আরো দুই একজনও। সকলেই অবাক।

ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে ঠাস ঠাস করে দু-গালে দুটো চড় বসিয়ে মালিক অন্য দিকে চলে গেল। মুখে একটি কথাও বলল না। সাধারণত গায়ে হাত পড়লেই আমার মেজাজ বিগড়োয়। কিন্তু এই দিন অপরাধীর মুখ আমার। অবচেতন মনের একটা গর্হিত লজ্জাকর অপরাধ ধরা পড়েছে যেন। রাগ বা অভিমানের বদলে সঙ্কুচিত আমি। শাস্তিটার ওখানেই শেষ কিনা আমি জানি না। মালিক এবারে না আমাকে তাড়িয়েই দেয়।

ভয়ে ভয়ে বোমারকে বললাম ঘটনাটা! শুনে তাজ্জব মুখ করে ও আমার দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর হাসতে লাগল। বলল, আমি ঠিক এমনি করে ওর মা-কে চুরি করে দেখতাম। এই জন্যেই তার এই মেয়েটাকেও এত ভালো লাগে আমার। কিন্তু আমি তো কখনো ধরা পড়িনি···তুই একটা হাঁদা।

মনিব নতুন করে আর কিছু শাস্তি দিল না বটে, কিন্তু দিন কতকের জন্য আমার মাথা কাটা গেল। ওই হতচ্ছাড়া বোমারই সকলকে বলে দিয়েছে। তাতে কোনো ভুল নেই। এমন কি সারাকেও বলেছে। চোখা-চোখি হলেই সারা ফিক ফিক করে হাসে আর আমার কান গরম হয়ে যায়। আর মুখ টিপে হাসে অন্যরাও। চাউনির ভিতর দিয়ে বিস্ময়

প্রকাশ করে, একেবারে মালিকের মেয়ের দিকে চোখ—অ্যাঁ! যে মালিক কিনা মারভিন জেনট্রি!

বোমারের গদগদ মুখ দেখলাম একদিন। তার জীবনের একমাত্র সোনার দিন সেটা। দিন নয় রাত। রাতে শোবার সময়ে আমাকেই জাপটে ধরল একেবারে। ওর আনন্দের কারণ শুনে আমারও আনন্দ হল। অধ্যবসায়ের ফল মিলেছে। এ-পর্যন্ত মারজোরির কাছে অনেক-বার বিয়ের বাসনা জানিয়েছে। আর জবাবে মারজোরি তাকে তেড়ে মারতে এসেছে। মালিকের কাছে নালিশ করবে বলে শাসিয়েছে।

কিন্তু বোমার নাছোড়বান্দা। আজ এতদিনে তার ভাগ্য প্রসন্ন। মারজোরি ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। ছুরির ফলার মতো মেয়ে এতদিনে প্রেমিকের মর্ম বুঝেছে। অবশ্য হঠাৎ এমন মন বদলাবার কারণও আছে একটু। ট্রেপিজের খেলা দেখায় যারা, তাদের মধ্যে একটা সুন্দর মতো ছেলের সঙ্গেই যা একটু ভাব-সাব ছিল দেমাকি মেয়ের। বিয়ে যদি করে তো ওকেই করবে ধরে নিয়েছিলাম। হঠাৎ কি কারণে তার ওপর বিরূপ মারজোরি। বোমারকে বলেছে ওটা একটা কাপুরুষ। ওটা বলতে জন, এত দিন যে ওর প্রিয়পাত্র ছিল।

এই বীতরাগের মুখে বারপুরুষের মতো বিয়ের প্রস্তাব করেছে বোমার। মারজোরি বলেছে, তুমি একটা ভাঁড়, তোমাকে বিয়ে করব কি!

বোমার বলেছে তুমি একখানা ছুরির ফলা—একমাত্র এই ভাঁড়ই ছুরি বসানোর জন্য তোমার সামনে বুক পেতে দিতে পারে—আর কেউ পারবে না, সকলেরই প্রাণের মায়া আছে।

মারজোরি হেসেছে, পরে ঘাড় কাত করে রাজী হয়েছে। তারপর সংশয় প্রকাশ করেছে।—কিন্তু মালিক কি মত দেবে?

বোমার অবাক।—বিয়ে করব আমি, মালিকের মতামতে কি এসে যায়? আর মত দেবেই বা না কেন, আমি আজই তাকে জানাচ্ছি।

শুনে অমন শক্ত মেয়েরও ত্রাস। তক্ষুনি সাবধান করেছে, মত নিক

আপত্তি নেই, কিন্তু কাকে বিয়ে করতে চায় এ-যেন কক্ষনো বলে না। বললে বোমারকে আর বিয়েই করবে না ও। কত মেয়েই তো আছে, মালিক যা-খুশি ভেবে নিক।

সেই রাতটা সত্যিকারের আনন্দের মধ্যে কেটেছিল আমার। সেই রাতে আমার জন্যেও দরদ উথলে উঠেছিল ওর। বলেছিল, তুই যে একেবারে খোদ মালিকের মেয়ের দিকে চোখ দিয়ে বসে আছিস, ছোটখাটো কারো দিকে নজর ফেরা, আমি যতটা সম্ভব তোকে সাহায্য করব।

কিন্তু পরদিনই বিষণ্ণ অথচ ক্রুদ্ধ মূর্তি বোমারের। সমাচার শুনে আমারও মন খারাপ। মালিকের অনুমতি চাইতে গেছল বোমার। আর্জি শুনেই চোখ লাল তার। প্রথমে জিজ্ঞাসা করেছে, কাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু বোমার নাম বলেনি, বলেছে ইউনিটেরই একজনকে।

—কাকে? মালিক ধমকেই উঠেছে।

কিন্তু নাম বলে কি প্রতিশ্রুতি ভাঙবে বোমার? সেই পাত্র নয়। জবাব দিয়েছে তার নাম এখন বলা যাবে না।

ব্যাস্। মনিবের মেজাজ আরো তিরিক্ষি। ঝাঁঝালো জবাব দিয়েছে, বিয়ে-থাওয়া করে ঘর-সংসার পাতার জায়গা নয় এটা ও-সব এখানে চলবে না। বিয়ে করতে হয় তো দুজনেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে করতে পারে। সাফ কথা।

রাগে গজ গজ করতে করতে ফিরে এসেছে বোমার। সে বেপরোয়া। চাকরি ছেড়েই মারজোরিকে বিয়ে করার সঙ্কল্প তার। বলল, হিংসে, বুঝলি না? স্রেফ হিংসে, ওর চোখের সামনে পরিবার নিয়ে সুখে থাকব, সহ্য হবে কি করে! সাধে অন্যের সঙ্গে বউ চলে যায়!…ইস ওর বউটাকে নিয়েই পালানোর কত সুযোগ পেয়েছিলাম, সাহস করে একদিন বুকে চেপে-চুপে ধরতে পারলে ঠিক আমার সঙ্গেই পালাত—আমি তার অনেক গলদ আর অনেক চুরির খবর জানতাম। ওর মতো লোকের সঙ্গে এই বিশ্বাসঘাতকতা করাই উচিত ছিল আমার।

…সারার মা জেসি জেনট্রি শুনেছি ওরই সমবয়সী ছিল। সেজন্যে নয়, আমার হাসি পেয়ে গেছল রাগের মুখে বোমারের খেদের কথা শুনে। সেই সঙ্গে বিষম দুশ্চিন্তাও হয়েছিল ওর জন্যে। গোঁয়ারটা মারজোরির জন্যে যে-রকম পাগল, ঠিক চাকরি ছেড়েই বিয়ে করবে ওকে। কিন্তু চাকরি ছাড়লে ওর চলবে কি করে—বিশেষ করে বিয়ে করার পর? অন্যত্র চাকরি নিলেই বা কত আর পাবে। এখানকার অর্ধেকও পাবে কিনা সন্দেহ। কর্তার সুনজরের মানুষ বলে এখানে মাস গেলে মোটা মাইনে পায়। তা না হলে যত ভালোই হোক, জোকারের মাইনে কত আর। টাকা-পয়সা দেওয়ার ব্যাপারে মালিকের দরাজ হাত সেটা কেউ অস্বীকার করে না। ওর ভাবনা ভাবতে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎটাও যেন অনিশ্চয়তায় দুলে দুলে উঠল। বোমার কাজ ছেড়ে চলে গেলে আমারই কি আর এখানে ভালো লাগবে?

ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, রাগের মাথায় কিছু করে না বসে। ক'টা দিন সবুর করো, কর্তার মত বদলাতেও তো পারে।

—নিকুচি করেছে কর্তার মতের। আমি কি তোর মতো দাস নাকি!

মারজোরি বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে-ও আমার মতোই পরামর্শ দিল, এবং সেটা মেনে না নিয়ে উপায় কি। চাকরি ছেড়েও ওকে বিয়ে করবার মতো বুকের পাটা আছে শুনে খুশী হয়ে সে নাকি ওকে একটা চুমুই খেয়ে বসল। গালে আর ঠোঁটে সেই ছোঁয়া এখনো নাকি চিড়বিড় করছে। এক কথায়, মারজোরি বুঝতে পেরেছে বোমার জনের মতো কাপুরুষ নয়। কিন্তু হুট করে চাকরি ছাড়তে সেও নিষেধ করেছে। দুটো বছর দুজনে মিলে যতটা সম্ভব টাকা জমানো যাক, তারপর মারভিনের মুখের ওপর চাকরি ছুঁড়ে দিয়ে এখান থেকে চলে যাবে।

অগত্যা সেই পরামর্শই স্থির।

এরপর বোমারের সমস্ত ধ্যানজ্ঞান টাকা। মাসের মাইনে মোটা-মুটি মারজোরির হাতে তুলে দিত। দুজনের টাকা একসঙ্গে ব্যাঙ্কে

জমা পড়ত। কিন্তু পড়ত মারজোরির নামে। এ-ব্যবস্থাটা কেন যেন আমার আদৌ মনঃপূত ছিল না। দুজনের টাকা আলাদা রাখলেই তো হয়, তারপর জুড়তে কতক্ষণ। কিন্তু সে-কথা বললেই মারমুখী মূর্তি বোমারের। বলেছে, তুই ব্যাটা ক্রীতদাস, তোর মন কত আর উঁচু হবে?

নিজের সিগারেটের টাকা পর্যন্ত রাখত না। আমি পয়সা খরচ করে ওকে সিগারেট খাওয়াতুম। কর্তার কাছ থেকেও ফালতু কয়েকটা টাকা পেত, তাই থেকেই টেনেটুনে হাতখরচ চালাত। খাওয়া-পরা তো প্রতিষ্ঠান থেকেই জোটে।

এমনিতে কিন্তু বোমার হিসেবী মানুষ মোটামুটি। ব্যাঙ্কে এত কালের চাকরির টাকাও কম জমেনি। তার থেকে তুলে তুলে মারজোরিকে প্রতি মাসেই কিছু না কিছু উপহার দিত। কালেভদ্রে দশ টাকা থেকে পাঁচটা টাকা খরচ করলেও মারজোরি রেগে যেত। উপহার পেয়ে খুশী হত, কিন্তু সেই সঙ্গে রাগও দেখাত, বলত তুমি উড়নচণ্ডে, তোমার ব্যাঙ্কের টাকাও আমি আমার নামে সরিয়ে আনছি। আমার মনটা সত্যিই তত বড় নয় বোধহয়, শুনে খুঁতখুঁত করত কেমন। প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতাম ব্যাঙ্কের আগের জমানো টাকা মারজোরির নামে সরানো হয়েছে কিনা। বোমার তাতেও রেগে যেত।

মারজোরি কবে ওকে ক'টা চুমু খেল রাতে শুয়ে সে-খবরটা আমাকে দেবেই। শো না থাকলে দুজনে আলাদা আলাদা বেড়াতে বেরোয়, যেন কেউ কাউকে চেনে না। তারপর দূরে এক জায়গায় গিয়ে দুজনে মেলে। ক্যাম্পের কাছে এসে আবার পৃথক দুজনে। বোমার সেদিন হাওয়ায় ভাসতে থাকে।

ওর ফুর্তি বাড়ছে আর আমার কমছে। ওকে হারানোর দিন এগিয়ে আসছে। ছ'মাস হয়ে গেল, আর তো মাত্র দেড়টা বছর। এরই মধ্যে দুই একটা বিসদৃশ ব্যাপার চোখে পড়ল আমার। আগে হলে বিসদৃশ লাগত না, এখন লাগে। আগের প্রিয়পাত্র জনের সঙ্গেও মারজোরিকে মাঝে মাঝে খোশমেজাজে গল্প-সল্প করতে দেখি। কিন্তু

সকলের সামনা-সামনি নয়, আড়লে-আবডালে। আর, তখন আমাকে দেখলেই ও কেমন সচকিত হয়ে যায়। একদিন বোমারকে বলেই ফেললাম, আজকাল ওই জনের সঙ্গে মারজোরির বেশ ভাব-সাব দেখি যে।

শোনা মাত্র বোমার আমাকে এই মারে তো সেই মারে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, ভাব হয়েছে তোর তাতে কি? তোর বাইরেটা যেমন কালো, ভেতরটাও তেমনি কালো। আমার মনে সন্দেহ ঢোকাতে চাস, কেমন? জন কি ওর শত্রু নাকি যে মুখ দেখবে না? মারজোরি তোর সঙ্গে মেশে, সকলের সঙ্গেই মেশে—তাহলে জন কি দোষ করল?

সেই থেকে আমি চুপ। ওদের আরো অন্তরঙ্গ মেলামেশা আমার চোখে পড়েছে, কিন্তু বোমারকে কিছু বলিনি।

ঠিক এক বছরের মাথায় জন চাকরি ছেড়ে চলে গেল। সার্কাসের লাইন আর ভালো লাগে না, অন্যত্র কোথায় নাকি একটা চাকরি জুটিয়েছে। যে যেতে চায় তাকে আটকে রাখবে, মালিক সেই মানুষ নয়। বলা মাত্র বিদায় দিয়েছে। বোমারের স্বার্থেই মনে মনে আমি একটু নিশ্চিন্ত হয়েছি। ইদানীং বোমারকেও মাঝে মাঝে বিমর্ষ দেখতাম। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তক্ষুনি ভাঁড়ামি শুরু করে দিত। কিন্তু যা-ই করুক, আগের মতো অত যে হাওয়ায় ভাসে না, সে আমি ঠিকই লক্ষ্য করতাম। এতদিনে নিশ্চিন্তি।

কিন্তু সাতদিন না যেতে আমিই বিমূঢ় সব থেকে বেশি। মারজোরি নিখোঁজ হঠাৎ। কোথাও তাকে দেখলাম না, সন্ধ্যার খেলায় তার আইটেমও বাতিল সেদিন। খোঁজ নিয়ে যা শুনলাম, তাজ্জব ব্যাপার। মালিক মারভিনের কাছ থেকে পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে সে-ও চলে গেছে।

সর্বক্ষণ গা জ্বলেছে আমার। রাতের খেলা শেষ হতে নাগাল পাওয়া মাত্র বোমারের ওপর চড়াও হয়েছি।—তুমি একটা আহাম্মক, তুমি একটা বুদ্ধু, কতদিন সাবধান করেছিলাম তোমাকে, তখন তো

তেড়ে মারতে এসেছিলে—এখন? বেশ হয়েছে, যেমন গবেট তেমনি আক্কেল হয়েছে।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। কটূক্তির ফলে বোমারেরও ক্ষেপে ওঠার কথা। কিন্তু তার বদলে স্বভাবসুলভ চপল গাম্ভীর্যে আমার দিকে তাকিয়ে ও চোখ পিট পিট করতে লাগল। শেষে বলল, আমি গবেট না গবেট তুই?

ওর হাবভাব দেখে আমার খটকা লাগল একটু।—কেন?

—মারজোরি আমাকে বিয়ে করবে না সেটা তুই এতদিনে বুঝলি?

এই রসিকতার মর্ম উদ্ধার করা গেল না।—তুমি কবে বুঝেছিলে?

—কম করে চার মাস আগে।

—বোঝার পরেও মাইনের টাকাটা তুমি ওর হাতে তুলে দিতে?

ভালো মুখ করে জবাব দিল, ও যা খুশি করুক, আমি কথার খেলাপ করব কেন।…তাছাড়া যাকে ভালবাসা যায় তাকে সব দিয়ে দিতেও গায়ে লাগে না। কত আর গেছে, হাজার কয়েক মাত্র, আরো দেরি হলে তো আরো যেত।

আরো যে যায়নি মুখে সেই তুষ্টির ভাব।—তুই একটা বোকারাম, ভাঁড়কে পারতে কেউ বিয়ে করে নাকি! বিয়ে নিয়ে কোনো মেয়ে ভাঁড়ামি করতে চায় না, বুঝলি?

বুঝে নির্বাক আমি। আরো কিছু সমাচার শোনাল বোমার, মেয়েটা যে কত ঝানু আমি কল্পনা করতে পারিনি। মারভিন বিয়েতে মত না দেবার ফলে ক্ষেপে গিয়ে মারজোরি জনকে নিয়ে চাকরি ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল। বোমারের আগে ওরাই মালিকের কাছে অনুমতি চাইতে গেছল। জনের তখন চাকরি ছাড়তে আপত্তি। ফলে মারজোরি জনের ওপরেও মর্মান্তিক রেগে গেছল, আর সেই রাগেই বোমারের দিকে ঝুঁকেছিল। সেই কারণেই বোমার কাকে বিয়ে করতে চায় সেটা কর্তার কাছে ফাঁস করতে বার বার নিষেধ করে দিয়েছিল। একই মেয়ে দুদিনের মধ্যে দুজনকে বিয়ে করতে চায় শুনলে মালিক বাজে মেয়ে ভাববে না?

মারজোরির সঙ্গে বোমারের অত মেলামেশা দেখে মাস কয়েক আগে মানিক নিজেই একদিন বোমারকে ডেকে জনের কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছিল। তার মধ্যে বোমার নিজেই অবশ্য কিছু-কিছু আঁচ পেয়েছে, ওদের আবার গোপন ভাব-সাব লক্ষ্য করেছে। নিজেই বলেছে ফ্র্যাংকি বোমারের চোখে ধুলো দেবে এমন শর্মা জন্মায়নি। আমি যখন প্রথম সাবধান করেছিলাম, তখন অবশ্য বিশ্বাস করেনি, উল্টে রাগ হয়ে গেছল। কিন্তু পরে নিজেই সব জেনেছে।

খানিক চুপ করে থেকে ও আবার বলল, ব্যাপার কি জানিস, ও হুট করে চলে গেল ভালোই হল, দিনের পর দিন এমনি না-বোঝার ভান করে থাকতে আমার বড় কষ্ট হত—ভাঁড় বলেই কেউ টের পায়নি—এখন নিশ্চিন্ত।

কেন যেন এরপর ওকে আমি হাঁদা গবেটও বলতে পারিনি। ও যে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছে ওর হাব-ভাবে এমনও মনে হয়নি। এর-পর থেকে দর্শককে বরং আরো বেশি হাসাতে পেরেছে। কিন্তু মাঝ রাতে এক-একদিন ঘুম ভেঙে দেখি ও বিছানায় চুপচাপ বসে আছে। একদিন টেনে শুইয়ে দিতে ও ছদ্মরাগে চোখ পাকিয়ে বলল, মারজোরিকে বুকে জড়িয়ে ধরার নরম-নরম স্বাদটা মনে করতে চেষ্টা করছিলাম—দিলি তো ব্যাগড়া।

॥ চার ॥

পরের বছর।

আমার জীবনের প্রথম স্মরণীয় বছর সেটা। আমার বয়স কুড়ি, সারার সতেরো। নিজের সঙ্গে ওই মেয়ের নামটাও পাশাপাশি রাখছি তার কারণ জীবনের এই স্মরণীয় নাটকের সে-ই নায়িকা।

কিন্তু সেই নাটক আকাশ থেকে পড়েছে। আমি উপলক্ষ মাত্র।

নিয়ামক ওপরের একজন। অদৃশ্য থেকে কেউ কলকাঠি না নাড়লে এমন হয় না, হতে পারে না।

তখন আমরা প্রাচ্যদেশে ঘুরছি। নতুন দেশ দেখছি এটুকুই যা আনন্দের। জীবনযাত্রা তেমনিই বৈচিত্র্যহীন প্রায়। না, আনন্দের আরো একটু গোপন রসদ আছে। সারা মনিব-কন্যা সারা জেনট্রি এই এক বছরে আরো ভর ভরতি হয়ে উঠেছে। ফলে ওকে দেখার লোভ আমার আগের থেকেও বেড়েছে। একবার বিপাকে পড়ার ফলে আমি দ্বিগুণ সতর্ক। দেখার চুরিটা কেউ টের পায় না, এমন কি বোমারও না। ওকে দেখলে দুচোখ প্রসন্ন হয় এই পর্যন্ত—এর বাইরে আর কোনো সম্ভাবনা আমার মনের কোণেও ঠাঁই পায় না। পাবে কেন, পাগল তো নই।

ঠিক জানি না, পরিবর্তন হয়তো একটু আমার মধ্যেও এসেছিল। এবারের ট্রিপে জন্তু-জানোয়ারগুলো খাওয়ানোর সম্পূর্ণ ভার আমার ওপর। বেনটন আসেনি। সে বুড়ো হয়েছে, মনিব তাকে মোটা টাকা দিয়ে বিদেয় করেছে।

একটু একটু করে ওই জন্তু-জানোয়ারগুলোকে প্রীতির চোখে দেখতে শুরু করেছি মানুষের সঙ্গ যখন ভালো লাগে না তখন ওদের কাছে যাই। ওদের হাবভাব আচরণ দেখি। ওদের রাগ-অনুরাগের অনেকরকম কাণ্ড-কারখানা লক্ষ্য করি। বেশ লাগে। হাতি ঘোড়া শিম্পাঞ্জী এমন কি বাঘগুলোও আমার বশ এখন। নির্বিঘ্নে প্রায় নির্ভয়ে ওদের গায়ে পিঠে হাত বুলোতে পারি। ভাব হয়নি কেবল সিংহ দুটোর সঙ্গে। ওরা অপেক্ষাকৃত নতুন। যেমন হৃষ্টপুষ্ট, তেমনি মেজাজ দুটোরই। সর্বদাই যেন রাগে ফুলছে। মনিব যখন খাঁচায় ঢুকে ওদের নিয়ে খেলা দেখায় তখন ভয়ে বুক টিপ টিপ করে আমার। প্রতি শো-তেই মনে হয় এই বুঝি দিলে থাবা বসিয়ে। কিন্তু মনিবেরও তেমনি বুকের পাটা আর তেমনি দাপট। এই মানুষটা সত্যি সত্যি পূর্বজন্মে সিংহ ছিল কিনা আমিও ভাবি সময় সময়। নইলে রক্ত-মাংসের মানুষের এত সাহস হয় কি করে।

না, সিংহ দুটো নয়, একটা সিংহ আর একটা সিংহী। লুই আর লিও নাম দুটোর। নাম দুটো মনিবের দেওয়া। চার মাস আগে এদিকে যাত্রা করার সময় পর্যন্ত বেনটনই ওদের খাবারটা দিয়েছে। এখন মনিবই বেশির ভাগ দিন নিজের হাতে ওদের দুটোকে খাবার দেয়, আমি সঙ্গে থাকি। মনিবের অনুপস্থিতে আমি দিই। এখনো ঠিক মনের মতো বশ হচ্ছে না বলেই হয়তো নিজের হাতে ওদের খাবারটা দিয়ে খাতির জমানোর চেষ্টা মনিবের। নতুন পশুর খাওয়া-দাওয়ার পরিমাণ আমি ঠিক ঠিক বুঝব না বলেও হতে পারে।

এই দুটোর সঙ্গেই শুধু আমি ভাব জমাতে চেষ্টা করিনি। মনে মনে লোভ আছে, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। একবারেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে। কপালে আর গালে বাঘের থাবার দাগ মাটি নেবার আগে মিলোবে না। বাঘের তুলনায় এ-দুটো তো শয়তান আর শয়তানী বিশেষ। সব সময়েই মেজাজে ফুটছে। সেই কারণেই ও দুটো মনিবের সব থেকে প্রিয় কিনা জানি না। কম করে বছর দেড়-দুই না গেলে আমি ওদের ধারে কাছে ঘেঁষছি না। তারপর আস্তে আস্তে ও দুটোও বশ যে হবে জানা কথাই। মনিবের পাশে দাঁড়িয়ে মাংস ছুঁড়ে দিই বলে ওরা এখনই আমাকে অন্য চোখে দেখবে সেই ভরসা করা বাতুলতা মাত্র।

কিন্তু কর্তার মতো আমারও কেন ও দুটোকেই সব থেকে বেশি ভালো লাগে? কেন ঘুরে ফিরে দিনের মধ্যে বহুবার এই দুটোরই খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে? বনের স্বাধীনতা খুইয়ে নতুন এসেছে বলে? সেই আক্রোশের তাজা রূপ দেখতে ভালো লাগে? নাকি, স্বাধীনতা খোয়ানোর দুঃখ, অসম্পূর্ণতার একটা বেদনা আমারও নিভৃতে আছে বলে?

ঠিক বুঝি না।

নিজের এই পরিবর্তনটুকুর দরুন মনিবের সঙ্গে ইদানীং অনেক বেশি দেখা হয় আমার। তারও তো ওই স্বভাব। দিনের মধ্যে কতবার করে যে ঘুরে ফিরে দেখে সিংহ দুটোকে ঠিক নেই। আমার সঙ্গে

যখন তখন দেখা হয়ে গেলে আগে বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাত। এখন আর তা করে না। আমার আকর্ষণটা টের পেয়েছে বোধহয়। মনে হয়, এই জন্যে ভিতরে ভিতরে একটু হয়তো খুশি আমার ওপর। কিন্তু সেটা প্রকাশ করা তার স্বভাব নয়।

এই প্রাচ্যদেশে এসে অপ্রত্যাশিত দুটো ঘটনার সূচনা। তার একটার হদিস পেয়ে রসিক বোমারেরও দুই চক্ষু কপালে। প্রতিষ্ঠানের মালিক মারভিন জেনট্রির সঙ্গে এক মাঝবয়সী মহিলার যোগাযোগ। বছর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হবে বয়েস। সুশ্রী, কিন্তু বেজায় গম্ভীর। আমরা যে দ্বীপে আছি তার নাম বোর্নিও। মহিলা এখানকার অর্থাৎ প্রাচ্যদেশীয়া কিনা বোঝা গেল না। মুখের ছাঁদ এখানকার মেয়েদের মতো নয়।

একদিন রাতের শো ভাঙতে মহিলাটি আপিস-ঘরের সামনে এসে একজনকে বলল মারভিন জেনট্রির সঙ্গে দেখা করতে চায়। নাম জিজ্ঞাসা করতে মাথা নেড়ে শুধু খবরটা দিতে অনুরোধ জানাল।

শ্রান্ত জেনট্রি নিজের তাঁবুতে সবে মদের গেলাস নিয়ে বসেছে। খবরটা আমিই জানাতে গেছলাম। শোনামাত্র মারভিন বিরক্ত।—কি নাম? কি জন্যে দেখা করতে চায়?

আমি জানালাম জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও মহিলা আর কিছু বলেনি।

—তাহলে চলে যেতে বল, এখন আমি ক্লান্ত।

ফিরে এলাম। আমার কেন যেন মনে হল খেলা দেখে যারা অভিনন্দন জানাতে আসে এই মহিলা তাদের একজন নয়। মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার মধ্যেও এক ধরনের মার্জিত গাম্ভীর্য লক্ষ্য করেছি। এখন দেখা হওয়া সম্ভব নয় শুনে মহিলা মুখ তুলে অদূরের ছোট তাঁবুটার দিকে তাকালো একবার। ধীর স্থির চাউনি। তারপর কারো অনুমতির অপেক্ষা না করে সেদিকে চলল।

আমার হাঁ-হাঁ করে ওঠার কথা, বাধা দেবার কথা। কিন্তু মহিলার এমনি ঠাণ্ডা আত্মস্থ ভঙ্গি যে আমি কিছুই করলাম না। বোকার মতো তাকে অনুসরণ করলাম শুধু।

পরদা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। আমি অর্ধেক ভিতরে অর্ধেক বাইরে। আমি যে নিরপরাধ সে-কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজনবোধে আমার উপস্থিত থাকার তাগিদ। কিন্তু যে-দৃশ্য দেখলাম সেটা বিস্ময়করই বটে। বিনা অনুমতিতে এ-ভাবে ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মালিকের উগ্র মূর্তি। কিন্তু পরমুহূর্তে যেন এক বালতি বরফজলের ঝাপটা পড়ল মুখে। স্থানকালবিস্মৃত মূর্তির মতো চেয়ে রইল তার দিকে। কর্তার এমন মুখ আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

মহিলাও নিষ্পলক চেয়ে আছে তার দিকে। ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আভাস। এত সূক্ষ্ম যে লক্ষ্য করে না দেখলে চোখে পড়ে না। মনে হল, মালিকের এই অপ্রত্যাশিত বিস্ময়টুকু উপভোগ্য তার কাছে। তাই কথা বলছে না।

একটু বাদে বলল, নাম বলিনি, কারণ নাম হয়তো ভুলেই গেছ এতদিনে।…চিনতে পারছ?

ততক্ষণে যেন বিস্ময়ের ঘোর কাটল মারভিনের। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, কি আশ্চর্য…তুমি!

কিছু বলার আগে মহিলা ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে মালিকের কাছে আমি যেন অপরাধী। চাপা গর্জন করে উঠল, গেট আউট।

পরদা ছেড়ে চোখের পলকে বাইরে আমি। কিন্তু বাইরে এসে পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে থাকল খানিকক্ষণ। কিন্তু কান পেতেও ভিতরের কথা শোনা গেল না।

অতঃপর আমাদের জল্পনা-কল্পনার পালা। বোমার এই প্রতিষ্ঠানের সব থেকে পুরনো লোক। অনেক ভেবেও সে এই গোছের কোনো মহিলাকে আগে কোথাও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। তবে অনেক কাল আগের একটা শোনা ঘটনা তার স্মরণে এলো। শুনেছিল মারভিনের স্ত্রী জেসি জেনট্রির মুখে। বোমারের সঙ্গে জেসির খাতির ছিল, স্বামীর প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ উপছে উঠলে সেই ক্ষোভের মুখে অনেক কথাই বলত। অল্প বয়েস থেকেই তার স্বামী যে লম্পট একটি, তার নজির হিসাবে ঘটনাটা বলেছিল।

প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। স্কটল্যাণ্ডে থাকতে মারভিন জেনট্রি বছর ষোল-সতেরোর একটি বড় ঘরের মেয়েকে নিয়ে দিন কতকের জন্য হাওয়া হয়ে গেছল কিছুদিন বাদে এক সুদূর পল্লীতে হানা দিয়ে পুলিস তাদের ধরে। বিচারে মারভিনের কঠিন সাজা হবার কথা নাবালিকা হরণের দায়ে। কিন্তু ষোল-সতেরো বছরের নাবালিকা মেয়ে বার বার হলপ করে বলেছে, কেউ তাকে জোর করে বা ফুসলিয়ে নিয়ে যায়নি—সে নিজের ইচ্ছায় গেছে। উল্টে সে-ই মারভিনকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে দূরে নিয়ে গেছে।

মেয়েটার কথা যে সত্যি নয় সকলেই জানত। সব থেকে বেশী জানত সেই মেয়ে নিজে। কারণ অতর্কিত দস্যুর মতোই মারভিন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। স্ত্রীর কাছে মারভিন গর্ব করে সেই ঘটনার কথা বলেছিল। বলেছিল, ওই মেয়ে তার মধ্যে একটি সত্যিকারের পুরুষ আবিষ্কার করেছিল বলেই আদালতে মিছে কথা বলে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। নেশার ঝোঁকে জেনট্রি নাকি অনেক সময় স্ত্রীকে বলত, মেয়ের মতো মেয়ে এ-যাবৎ সে ওই একটিই দেখেছে। বলত, তার বাপ-মা ওই মেয়েকে নিয়ে হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে গেল বলেই জেসি আজ তার স্ত্রী।

সব শোনার পর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হল এ-মহিলা সেই মেয়ে।

মহিলা তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এলো ঘণ্টাখানেক বাদে। তার সঙ্গে মারভিনও। এই এক ঘণ্টার মধ্যেই মারভিনের অন্যরকম মুখ। এই মুখ দেখলে কেউ তাকে রুক্ষ উগ্র মানুষ বলবে না। কি এক অব্যক্ত চাপা খুশীতে ডগমগ যেন।

অদূরের রাস্তায় প্রকাণ্ড ঝকঝকে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। ওটা দেখলেই বোঝা যায় গাড়ির মালিক বেশ অবস্থাপন্ন। ড্রাইভারের আসন নিয়ে মহিলা নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে চলে গেল। হেলে-দুলে নিজের তাঁবুর দিকে চলল মারভিন জেনট্রি।

এর পরেই ক'টা দিন একটা দ্রুত পরিবর্তনের জোয়ারে ভাসতে লাগলাম আমরা। প্রত্যেক দিন বেশ সকালে বেরিয়ে যায় মারভিন—

ফেরে সেই বিকালের শোয়ের আগে সঙ্গে সেই মহিলা মালিকের তাঁবুতে রাতের খাওয়া-পিনা সেরে ঘরে ফেরে।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আমরাও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। মহিলার নাম ডরোথি—ডরোথি জেরোম। বিধবা। তিন ছেলের মা। বড় ছেলের বয়েস বছর পঁচিশ, মস্ত অবস্থা। আমাদের মালিকের থেকেও বড় হতে পারে। মহিলার বাবারের ব্যবসা। এই বিশাল দ্বীপে তেল আর রাবার প্রধান শিল্প। এই দুই পণ্যের দরুন সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ এই দ্বীপটার।

প্রথম যোগাযোগের দিন পাঁচেকের মধ্যেই রাতের আবাস বদলালো মারভিন জেনট্রি। সব থেকে নামী হোটেলের দামী সুইট ভাড়া করল। সবত্রই তাই করার কথা। কিন্তু তাঁবুতে বাসই পছন্দ তার। দলের সঙ্গে থেকেও নিঃসঙ্গ।

সারা জেনট্রি তাঁবুতেই থেকে গেল, বাপের সঙ্গে দু'ঘরের সুইট্-এ থাকতে রাজী হল না। বাবার হঠাৎ এ-রকম একটা পরিবর্তন দেখে বেচারী হকচকিয়ে গেছে। আমাদের মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায় আর ব্যাপারখানা বুঝতে চেষ্টা করে। মারভিন মেয়েকে সুইট্-এ নেবার জন্য একটুও পীড়াপীড়ি করেনি। বরং আমার ধারণা, এই ব্যবস্থাই তার কাম্য ছিল।

ডরোথি জেরোমের গাড়ি থেকে সেদিন একটি সুশ্রী ছেলেও নামল। বছর পঁচিশেক বয়েস। পরে জেনেছি, ওটিই মহিলার বড় ছেলে। নাম হেক্টার জেরোম। ওই মা-ই ছেলের সঙ্গে মনিব কন্যা সারার আলাপ করিয়ে দিল।

কিন্তু আলাপ যে এমন দ্রুতভাবে ঘন হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। হেক্টার দু'বেলা আসা শুরু করল। আর, এলে শীগগীর ফেরার নাম নেই। দূর থেকে তাকে দেখলেই সমস্ত মুখ হাসিতে ঠেসে সারা তাকে অভ্যর্থনা জানাবার আগ্রহে ছুটে বেরিয়ে যায়। আমি আর বোমার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। বোমার ঘটা করে চোখ পিট পিট করে।

মাত্র তিন দিনের পরিচয়েই আমার মনে হল ওরা যেন তিন বছরের সখা-সখী। দুজনেই হাত ধরাধরি করে বেড়ায়, হাসা-হাসি করে, গল্প করে। আমার ধারণা, কোনো এক কালের প্রণয়ী-প্রণয়িণীর ছেলে-মেয়ে ওরা সেটা দুজনেই জেনেছে। জেনেছে বলেই দ্রুততালের রোমাঞ্চকর ঘনিষ্ঠতা। আমি আর বোমার রীতিমতো গবেষণা শুরু করে দিলাম এর পর কি ঘটতে পারে।...

ডরোথি মিসেস জেনট্রি হবে, আর সারা মিসেস জেরোম! ভাবতে গিয়ে ভয়ানক অস্বাভাবিক লাগল আমার। ছেলে-মেয়ের বিয়েটা যদি বা হয়, ওদের বাপ-মা'র বিয়ে হতে পারে বলে আমার মনে হচ্ছে না। রাতারাতি পরিবর্তন শুধু কর্তারই দেখছি, মহিলার মিষ্টি মুখ সেই প্রথম দিনের মতোই রাশভারী গম্ভীর সর্বদা। আত্মমর্যাদাবোধে ধীর ঠাণ্ডা।

সেদিন দুপুরের দিকে সারাকে না দেখে আমি এদিক-ওদিক খুঁজলাম একটু। হেস্টারকেও আসতে দেখিনি....তাহলে গেল কোথায়? চার দিকে জঙ্গল আর পাহাড়ের রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার মেয়ে নয় সারা। মনের তলায় অস্বস্তিকর সংশয় উঁকিঝুঁকি দিল আমার। অনাগত কিছুর গন্ধ পাওয়া আমার বোধহয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।

জঙ্গল-ঘেষা পাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। চোখ-কান সজাগ আমার।

প্রায় মাইল খানেক এগোবার পর এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালাম। জঙ্গলের পাশের নির্জন রাস্তা-সংলগ্ন উঠানের মতো একটু পাহাড়ী জায়গায় ছোট একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। দেখেই চিনলাম। হেস্টারের গাড়ি। অন্য গাড়ি চলাচলের অসুবিধে হবে বলেই গাড়িটা ওখানে রাখা হয়েছে।

গাড়িতে কেউ নেই। শূন্য।

আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম খানিক। মাথার মধ্যে কি হতে থাকল সঠিক বলতে পারব না। আর যা-ই হোক ঈর্ষা নয়।

কারণ তখনো আমি মনিব-কন্যাকে নিয়ে কোনো অবাস্তব স্বপ্নের ধারে-কাছে ঘেঁষিনি। একটা অদ্ভুত অস্বস্তি মাথার মধ্যে দাপাদাপি করতে লাগল।

...রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। নিবিড় জঙ্গল নয়। মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা। সন্তর্পণে এগোতে এগোতে অমনি একটা ফাঁকা জাগয়ার সামনে আমার পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল।

—ও হেস্টার, প্লাজ্, প্লাজ্।

একটা বিশাল গাছের নাচে ওরা দুজন। সারা মাটিতে শুয়ে, ওর বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে হেস্টার। ঠোঁটে গালে অজস্র চুমু খাচ্ছে, নিজের বুক দিয়ে ওর বুকটা পিষছে, একটা হাত বেসামাল হয়ে ওর সর্বাঙ্গ অবশ করে দিতে চাইছে। তার মতলব বুঝেই মেয়েটা ঘাবড়েছে। বুক থেকে তাকে সরাতে চেষ্টা করে মিনতি জানাচ্ছে, ও হেস্টার, প্লীজ নট ছ্যাট্—

হেসে উঠে হেস্টার আরো ভালো করে দখল নিতে চেষ্টা করল। হালকা অনুশাসনের সুরে বলল, আচ্ছা ভীতু মেয়ে তো। মায়ের মুখে শুনেছি তোমার বাবা একটা দুর্ধর্ষ পুরুষ ছিল, তার মেয়ে এই!

—ও হেস্টার, প্লীজ্, প্লীজ!

মাথাটা ঝিমঝিম করছিল আমার। ঝোপের আড়ালে থাকা গেল না। ওদের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল হেস্টার সারাও। ওকে ছেড়ে দিয়ে হেস্টার ঘুরে বসল। সারার সমস্ত মুখ টকটকে লাল। পলকের মধ্যে বেশ-বাস বিন্যস্ত করে নেবার চেষ্টা।

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হেস্টার গর্জন করে উঠল, হু আর ইউ?

জবাব না পেয়েও বুঝল বোধহয় কে আমি। এর মধ্যে অনেক-বার দেখেছে। এবারে ঘুষি বাগিয়ে দ্বিগুণ চিৎকার করে এগিয়ে এলো।—গেট্ আউট্ ফ্রম হিয়ার, ব্লাডি বাস্টার্ড।

আমারও কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল তাতে কোনো ভুল নেই। ভয় পাওয়ার বদলে দু'পা পিছিয়ে এসেছি। তারপর কোমরে গোঁজা

সর্বক্ষণের সঙ্গী ছোরাটাকে খাপ থেকে টেনে বার করেছি। ওর চোখে চোখ।—আসবে?

ছোরা দেখে হোক বা এ-রকম ঠাণ্ডা অভ্যর্থনার দরুন হোক, হেস্টার থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর হন-হন করে প্রস্থান করল।

আমি ঘুরে সারার দিকে তাকালাম। এমন পরিস্থিতিতে পড়ে ও ঝলসেই উঠল হঠাৎ।—তুমি আমাকে ফলো করছিলে?

আমি নির্বাক। ওর দিকে চেয়ে আছি। এটাই বোধকবি ওর কাছে সব থেকে বেশী অস্বস্তিকর। ঘুরে হন-হন করে এগিয়ে চলল সে-ও।

—দাঁড়াও।

থমকে দাঁড়াল। ঘুরে তাকাল।

—বেরুবার পথ ও-দিকে নয়, এদিকে।

অগত্যা ফিরে আবার আমার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল।

গাড়ি নিয়ে হেস্টার উধাও হয়েছে। সারা আগে আগে হাঁটছে। আমি গজ দশেক পিছনে। খানিক আগে কম করে বিশ গজ পিছনে ছিলাম। অর্থাৎ আপনা থেকেই সারার হাঁটার গতি কমছে লক্ষ্য করছি।

ব্যবধান আরো কমে আসতে লাগল।…পাঁচ গজ…তিন গজ… এক গজ।

তারপর পাশাপাশি।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম। মুখখানা ফ্যাকাশে এখন।

টনি—

গলার স্বর করুণ। চাউনিটা আরো।

আমি জিজ্ঞাসু।

—তুমি ভালো লোক টনি।…বাবাকে কিছু বোলো না। বলবে না তো?

আমার মনে হল এ-রকম প্রতিশ্রুতি দেবার শর্ত হিসেবে ওকে

যদি একবার বুকেও টেনে নি, ও তাও হজম করবে হয়তো। মাথা নাড়লাম বলব না।

সারার মুখের ফ্যাকাশে ভাব কমল একটু।—ঠিক তো?

মাথা নাড়লাম। ঠিক।

একটু চুপ করে থেকে সারা আবার বলল, তুমি এসে ভালোই করেছ, হেস্টাবটা এত পাজী ভাবতে পারিনি।

আমি একটিও মন্তব্য করিনি।

রাতের শো ভাঙতে মনিবের তাঁবুতে আমার ডাক পড়ল। আর মাত্র তু'দিনের তুটো শো হলেই এখানকাব পাট ভেঙে আমাদের দ্বীপের একেবারে অন্য প্রান্তে যাবার কথা। ট্রেনে গেলে মাঝে একদিন, আর ট্রাকে গেলে মাঝে দেড় দিনের দীর্ঘ পথ। ভাবলাম, মনিবের মুখ সন্ধ্যা থেকে গম্ভীর দেখছি হয়তো এই কারণেই। তার প্রিয়তমা ডরোথি জেরোমের মুখখানাও থমথমে। হয়তো বা বিচ্ছেদ জোড়বার ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তুজনের মধ্যে একটু মন-কষাকষি হয়েছে। কিন্তু তাঁবুতে আমার ডাক পড়তে চমকেই উঠলাম। তাহলে কি অন্য কিছু?

যেতে গিয়ে সামনে সারার সঙ্গে চোখাচোখি। অজানা আশঙ্কায় তার সমস্ত মুখ বিবর্ণ আবার। চাউনিতে প্রতিশ্রুতি রক্ষাব করুণ মিনতি।

পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললাম।

ভিতরে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র মারভিন চাপা হুঙ্কার ছাড়ল।—আজ তুপুরে হেস্টারকে অপমান করেছিস?

জবাব না দিয়ে আমি সভয়ে একবার ডরোথি জেরোমের দিকে তাকালাম। তার স্থির কঠিন মুখ। মনিবের দিকে ফিরলাম।

আরো নির্মম আক্রোশে মনিব আবার জিজ্ঞাসা করল, হেস্টারকে ছোরা নিয়ে তাড়া করেছিলি?

এবারে জবাব দিলাম। বললাম, সে আমাকে মারতে এসেছিল।

—কেন মারতে এসেছিল?

সারার করুণ মুখখানা চোখে ভাসল। জবাব না দিয়ে আমি মাথা

নীচু করলাম। এক লাফে চেয়ার ঠেলে উঠে মারভিন এক হাতে আমার চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে টেবিলের ও-পাশে নিয়ে গেল।—কেন মারতে এসেছিল ?

আমি নির্বাক। কেন আমাকে এদিকে টেনে নিয়ে এলো জানি। এদিকের আলনায় তার চাবুক ঝুলছে।

ক্ষিপ্ত আক্রোশে চাবুক চলল। আমার কাঁধ পিঠ হাত ফেটে চৌচির হয়ে যেতে লাগল। এক-একটা ঘা পড়ছে আর জ্বলে জ্বলে যাচ্ছে। চোখে অন্ধকার দেখছি, প্রাণপণে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে আছি। মুখ দিয়ে একটা যাতনার শব্দও বার করছি না। এই কারণেই বোধহয় মনিবের আক্রোশ বাড়ছে। হাতের চাবুক আরো নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে। চাবুক ফেলে শেষে পাগলের মতো কিল চড় লাথি।

ডরোথি জেরোম তেমনি স্থির গম্ভীর।

তাঁবুর বাইবে অনেকে এসে জড়ো হয়েছিল, বোমারও। বেরিয়ে আসতে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে চলল। শরীরের যাতনায় আমি প্রায় অচেতন। আত্মস্থ হয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম একবার···সামনে সারা—তার চোখে নির্বাক ত্রাস।

রাত্রির মধ্যেই আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আর আমি মারভিন জেনট্রির দলের সঙ্গে থাকব না। না খেয়ে মরি তাও ভালো, ক্রীতদাসের জীবন এই শেষ! এব আর নড়চড় হবে না। ওর বোর্নিওতে দশ দিনের প্রোগ্রাম। এর মধ্যে সকলেব অলক্ষ্যে সেখান থেকে জাহাজে ওঠা অসম্ভব হবে না হয়তো। তা যদি না পারি তো সকলের সঙ্গেই সমুদ্র পাড়ি দেব। মেন ল্যাণ্ডে পা দেবার পর মারভিন জেনট্রি আব আমার মুখ দেখবে না।

সংকল্পের কথা কাউকে বললাম না। বোমারকেও না। কারো কোনোরকম বাধা দেবার রাস্তাও রাখব না।

পরদিন শয্যা ছেড়ে উঠতেই পারলাম না। সর্বাঙ্গে যাতনা। জ্বালা। জ্বরও হয়েছে একটু বুঝতে পারছি। কেন এত বড় একটা

মার খেলাম, কেউ জানে না। সহানুভূতি দেখাতে এসে সকলেই উৎসুক। মারভিনের গর্জনের ফলে আমি যে ডরোথি জেরোমের ছেলে হেস্টাব জেরোমকে ছোরা নিয়ে তাড়া করেছিলাম, বাইরে থেকে একথা কেউ কেউ শুনেছে। সকলের মধ্যে সেটাই রাষ্ট্র হয়েছে।

কিন্তু কেন কেন কেন? কেন আমি ছোরা নিয়ে তাড়া করলাম? আমার কাছে এসে এরই জবাব খুঁজছে সকলে।

আশা করেছিলাম তারা চুপি চুপি এসে একবার অন্তত আমাকে দেখে যাবে। এলো না। পরে যখন দেখা হয়েছে তখনো একটা কৃতজ্ঞ চাউনি দিয়েও আমাকে খুশী করতে চেষ্টা করেনি। উল্টে রাগ-রাগ ভাব। বিরক্ত মুখ করে দূরে সরে গেছে।

অনুমান, ওর সতেরো বছরের জীবনের দুর্বলতম মুহূর্তের সাক্ষী আমি—রাগটা এই কারণে। আমি গিয়ে না পড়লে ব্যাপারটা কোন চরমে পৌঁছুত তাও ভাবছে না হয়তো…হয়তো বা এই ক'দিনের মধ্যে হেস্টারকে ভালোই বেসে ফেলেছে। তাই, প্রাথমিক ভয়টা কেটে যেতে এখন আমার ওপরে বিরূপ।

বোমার আমাকে খবর দিল, গতকাল রাতে মনিব তার হোটেলের সুইটে যায়নি, এখানেই থেকেছে। আজও বেরোয়নি। থমথমে মুখ সারাক্ষণ। সকাল থেকেই মদ গিলছে।

আমি নিস্পৃহ। মারভিন জেনট্রি আর আমার মনিব নয়।

সেদিন সকলেই ভালো করে লক্ষ্য করেছে, ডরোথি জেরোম একবারও তার প্রিয়-সন্নিধানে আসেনি। আর সেই রাতে খেলা দেখাবার সময় আমাদের তেজী সিংহ দুটো নাকি মনিবের হাতে বেদম মার খেয়েছে।

পরদিন আমি খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি। বোমার যতটুকু সম্ভব আমার পরিচর্যা করেছে। গায়ে তেল ডলে দিয়েছে, ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছে, আর ক্ষুব্ধ স্বরে নিজের মনেই বক্ বক্ করে গেছে।

—বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ালে এই রকমই ফল হয়। মনিবের মেয়ে যার সঙ্গে খুশি প্রেমে মজুক তাতে কার কি, তার জন্যে হিংসা

কেন—একজনকে ছোরা দেখিয়ে সরিয়ে দিলেই কি মনিব তার চাকরকে জামাই করে বসবে? যেমন কর্ম তেমনি ফল—বেশ হয়েছে আক্কেল হয়েছে, ইত্যাদি।

আমার মুখ সেলাই। একটি কথাও বলিনি, একবারও প্রতিবাদ করিনি। বোমার মহা চতুর, কি কথা থেকে কি কথা টেনে বার করবে ঠিক নেই। সে জানালো মালিকের প্রেয়সী আজও আসেনি আর মনিবের সেই রকমই থমথমে মুখ। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তাঁবু থেকে বেরোয়নি—সমস্ত দিন কেবল মদ গিলেছে।

রাত তখন একটা দেড়টা হবে। আমার ঘুম আসছে না। পাশে বোমার গভীর নিদ্রায় অচেতন। বাইরে অনেকেই জেগে আজ। ম্যানেজার তাদের নিয়ে গোছগাছে ব্যস্ত। সমস্ত রাত কাজ চলবে। আগামী কাল বেলা দশটা এগারোটার মধ্যে উত্তর প্রান্তে রওনা হবার নির্দেশ।

নিঃশব্দে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলাম। যেদিকে লোকজন সেদিকে না গিয়ে পায়ে পায়ে উল্টো দিকে চললাম। এই দিকে বাঘ-সিংহের খাঁচা। বাঘগুলো কুকুরের মতো শরীর গুটিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওদের বিরক্ত না করে সিংহের খাঁচার দিকে এলাম। এ দুটোও গা ছেড়ে বিশ্রাম করছে। আমাকে দেখে সিংহটা একবার মাথা তুলে তাকালো। গলা দিয়ে মৃদুগম্ভীর গোঁ-গোঁ শব্দ বার করল একটু। অর্থাৎ মানুষ দেখে খুশী নয়।

বুকের ভিতরটা টন টন করছে কেমন। এইসব পশুগুলোকে যে কত ভালবেসে ফেলেছি নিজেও জানতুম না। বশ মানেনি বলেই হয়তো সিংহ দুটোর ওপর আরো বেশি টান আমার। খাঁচার আর একটু কাছে এসে দাঁড়াতে আবার মাথা তুলে তাকালো আমার দিকে। আবছা অন্ধকারে দু'চোখ জ্বলজ্বল করছে। ওকেই বিড়বিড় করে বললাম, আমি তো চলে যাচ্ছি রে, তোদের সঙ্গে ভাব আর হলই না।

চমকে ঘুরে তাকালাম। এদিকে আসছে কে। আর একটু এগোতে

চিনলাম।...পা দুটো বেশ টলছে তার। প্রতিষ্ঠানের মালিক মারভিন জেনট্রি।

তাকে দেখে নিজেকে আমি পাথরের মতো শক্ত করে তুলতে চেষ্টা করলাম।

মারভিন কাছে এলো, ঝুঁকে নিরীক্ষণ করে দেখল আমাকে নাকে মদের গন্ধের ঝাপটা লাগল একটা। পশুগুলোর ওপর আমার টান আগেও অনেকদিন লক্ষ্য করেছে। এখন কি দেখছে জানি না।

—কি করছিস?

গলার স্বরটা ততটা রুক্ষ নয়। নেশার দরুন সম্ভবত।

—কিছু না।

—ঘুমোসনি কেন?

জবাব দিলাম না। দু'কাঁধে হাত দিয়ে মারভিন আমাকে সোজা তার দিকে ফেরালো। চাপা আগ্রহে গলার স্বর আরো নরম।—হেস্টারকে কেন ছোরা নিয়ে তাড়া করেছিলি আজ বলবি?

আমার স্নায়ুতে রক্ত জমাট বাঁধছে। তার দিকেই চেয়ে আমি। নিরুত্তর।

—মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও বলে হিংসেয়। ওর কথা আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না...ও অনেকটা ওর মায়ের মতো হয়ে উঠেছে ...হেস্টারকে ছোরা নিয়ে তাড়া করেছিলি কেন?

আমি চেয়ে আছি। চোখে চোখ। বললাম, আপনার চাবুকটা নিয়ে এসে চেষ্টা করুন।

অর্থাৎ, আজও আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না। মারভিন ঝুঁকে ছিল, আস্তে আস্তে টান হয়ে দাঁড়াল। কোন কর্মচারীর মুখে এ-রকম উক্তি আর বোধহয় শোনেনি। তাই রাগ যেমন, বিস্ময়ও তেমনি।

ঠাস করে গালে একটা চড় পড়ল। তারপর টলতে টলতে চলে গেল। চড়ের জ্বলুনি টের পাচ্ছি। কিন্তু স্থির ঠাণ্ডা আমি। আজ যন্ত্রণার থেকে আনন্দ বেশি। মারভিন অদৃশ্য হতে ঘুরে একবার খাঁচার

দিকে তাকালাম। সিংহটার সঙ্গে এবার সিংহীটাও মাথা তুলে আমাকে দেখছে।

তাঁবুতে ফিরে এলাম। ঘুমের আশায় জলাঞ্জলি।...সারা জেনট্রি বাপকে বলেছে আমি হিংসেয় ছোরা বার করেছিলাম। এই বলে বাপের কোপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছে। শোনার পর থেকে একটা হিংস্র বাসনা সত্যিই আমার মাথার মধ্যে জ্বলছে। যা আগে কখনো হয় নি। যেমন করে ও হেস্টারের কবলে গিয়ে পড়েছিল, ঠিক তেমনি করেই ওকে এবার নিজের দখলে টেনে আনতে ইচ্ছে করছে।

তার থেকেও বেশি নির্মম নিষ্ঠুর দখলে।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার মধ্যেই সারি সারি ট্রাক চলল উত্তর বোর্নিওর পথে। বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে আমি শুধু যেতে দেখলাম।

মাত্র আধঘণ্টা আগে বোমার জানিয়েছে, এই দলের সঙ্গে আমি যাচ্ছি না। আমার যাত্রা আগামী কাল, কর্তার সঙ্গে। মারভিন আরো একটা দিন থাকবে এখানে। অতএব সারাও থাকবে। একজন লোক দরকার—তাই আমিও থাকব।

কিছু মালপত্র সহ সিংহ দুটোও আমাদের সহযাত্রী হিসেবে থেকে গেল। এখনো যে একরোখা স্বভাব ও-দুটোর, কর্তা ওদের নিজের তদারকের আওতায় রাখতে চায়। আমি ভিতরে ভিতরে গজরাতে লাগলাম। মালিকবিহীন আগের দলের সঙ্গে যেতে পারলে হয়তো এই একদিনের মধ্যেই সকলের অলক্ষ্যে চলে যাবার সুযোগ মিলত।

জায়গাটা ভয়ানক ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। আধখানা মাঠ জুড়ে ছিলাম এতদিন। এখন দুটো মাত্র তাঁবু। আমারটা খুবই ছোট। মালিকেরটা মাঝারি। তাঁর তাঁবুর মাঝখানে ত্রিপলের পার্টিশনের ওধারে মেয়ে থাকি।

ট্রাকগুলো সব অদৃশ্য হতে মারভিন নিজের তাঁবুতে ঢুকে মদ নিয়ে বসল। আমি ভেবেছিলাম মেয়েকে নিয়ে সে হোটেলের সুইটে চলে যাবে। গেল না। আমার মনে হল সে কারো বা কোনো কিছুর

প্রতীক্ষায় আছে। এক-একবার এসে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে, আবার ভিতরে ঢুকে মদ গিলছে।

সারা জেনট্রি একান্ত নিঃসঙ্গভাবে নিজের মনেই ঘুর ঘুর করছে। ইচ্ছে থাকলেও আমার দিকে ঘেঁষছে না। আমার মুখ দেখেই সম্ভবত। তাছাড়া নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন তো বটেই। চোখাচোখি হলে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে আমি চাকর বই আর কিছু নই।

...আমিও তফাতেই থেকেছি। কারণ, আমার ভয় ধরেছে। ভয় নিজেকেই। আমার বাসনার দরুনই কি ওপরঅলার এই কারসাজি, মালিকের এই মতি। নির্মম ক্রোধে ওই মেয়েটাকে যে দখলের আওতায় পেতে চেয়েছিলাম—সেই সুযোগ এগিয়ে আসছে? আমার মুখের একটু সদয় ভাব দেখলে সারা হয়তো খুশী হয়েই কথা বলতে এগিতে আসত। মানুষ বোবা হয়ে কতক্ষণ থাকতে পারে? কিন্তু সদয় মুখ দেখছে না। নিজের মতিগতির ওপর এখন বিশ্বাস কম বলে মুখের ওপর ক্রূর আবরণ টেনে আমিই ওকে তফাতে সরিয়ে রাখছি।

পরদিনও সকাল দশটা পর্যন্ত আমাদের যাবার কোনো লক্ষণ নেই। মারভিনের নীরব অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, ছটফটানি বাড়ছে, মদের মাত্রা বাড়ছে—সবই আমি লক্ষ্য করছি।

খানিক বাদে মারভিন জেনট্রি তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে ইশারায় ডাকল আমাকে। গেলাম। একটা মুখ-আঁটা খাম আমার হাতে দিল। কোথায় কার হাতে চিঠিটা দিয়ে জবাব আনতে হবে বুঝিয়ে আবার ভিতরে ঢুকে গেল।

খামের ওপর ডরোথি জেরোমের নাম। তারই হাতে দিতে হবে।

ভয় ধরার কথা। মহিলা নিজের চোখের সামনে আমাকে আধমরা হতে দেখেছে। কিন্তু তার ছেলে দেখেনি। আওতার মধ্যে পেলে সে হয়তো আমাকে ছেড়ে দেবে না। কিন্তু এই ক'দিনে আমারও ভিতরটা ওলট-পালট হয়ে গেছে। সমস্ত ভয়-ডর উবে গেছে। ঠাণ্ডা মুখেই

আমি চিঠি পৌঁছে দিতে চললাম। চিঠিটা খুলে পড়ার লোভ অনেক কষ্টে সংবরণ করা গেছে।

শহরের বুকে হাল-ফ্যাশনের মস্ত আপিস-বাড়ি জেরোম অ্যাণ্ড সন্‌স্‌-এর হদিস পেতে একটুও সময় লাগল না। ভিতরে ঢুকতে সামনা-সামনি দেখা যার সঙ্গে, সে হেস্টার। আমাকে দেখামাত্র দুই চোখ ঝকঝকে দুটো ছুরির ফলার মতো হয়ে উঠল।

—হোয়ট ডু ইউ ওয়াণ্ট?

—মিসেস জেরোমের নামে চিঠি আছে। মালিক পাঠিয়েছেন.

—দেখি?

দেখালাম। তবে হাতে দিলাম না।

ছোঁ মেরে খামটা হাত থেকে নিয়ে নিল। উল্টে-পাল্টে দেখল একবার। ক্রুদ্ধ দুই চোখ আমার মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে গটগট করে চলে গেল। অদূরের একটা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল।

আমি নিশ্চল দাঁড়িয়ে।

একটু বাদে হেস্টার দরজা ঠেলে আবার বেরিয়ে এলো। একটু আঙুল নেড়ে কুকুর ডাকার মতো করে আমাকে ডাকল। এগিয়ে যেতে আমাকে নিয়ে দরজা ঠেলে আবার ভিতরে ঢুকল।

মস্ত টেবিলের ও-ধারে রিভলভিং চেয়ারে বসে মিসেস ডরোথি জেরোম। সেই রকম নয়, তার থেকেও বেশি ঠাণ্ডা বেশি কঠিন মূর্তি।

আমার দিকে তাকালো। দেখল কয়েক পলক।—জবাব নিয়ে যেতে বলেছে?

আমি মাথা নাড়লাম। তাই।

চিঠিটা-খামসুদ্ধু কুটি-পাটি করে ছিঁড়ল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ওগুলো কার্পেটের ওপরে ফেলে সজোরে পায়ে করে ঘষতে লাগল।

—বলোগে এই জবাব দিয়েছি।

ফিরে আবার চেয়ারে বসার আগে ছেলের দিকে তাকালো একবার। সেই ঝাঁঝালো দৃষ্টির ঘায়ে ছেলেও সঙ্কুচিত। চাউনিটি কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল আমার।

বেরিয়ে এলাম। পিছনে হেস্টার।—হেই!

ফিরে তাকালাম। আমাকেই ডাকছে। রাগের বদলে একটু হাসি-হাসি মুখ। এগিয়ে এসে ঈষৎ অন্তরঙ্গভাবেই আমাকে আর একদিকে নিয়ে চলল। অপেক্ষাকৃত একটা ছোট ঘরে ঢুকল। এটা তারই খাস কামরা বোঝা গেল। আমাকে বসতে বলে নিজেও বসল। আমি তক্ষুনি বুঝে নিলাম হঠাৎ মেজাজের এই পরিবর্তন মতলবশূন্য নয়।

—চা না কফি?

—কিছু না।

—ও ফরগেট্ এভরিথিং। এখন আর তোমার ওপর আমার একটুও রাগ নেই।

রাগ ছিল কিনা সেটা একটু আগের সাক্ষাতেই বোঝা গেছে। আমি নির্বাক এবং মনে মনে প্রস্তুত।

তোমার নাম কি হে?

—টনি।

—মায়ের মুখে শুনলাম আমাকে ছোরা দেখাবার জন্য মালিক তোমাকে বেজায় পিটেছে। অত মার খেয়েও মুখ বুজে তার তাঁবেদারি করছ। তোমার দোষ কি, তুমি তো প্রভুভক্তের কাজই করেছিলে—

একটা ষষ্ঠ চেতনা দ্রুত কাজ করছে। মতলব বোঝার জন্যই ইন্ধন যোগানো দরকার। বললাম, প্রায়ই মারে—এই দ্বীপ ছাড়ার পর এ-রকম মালিকের কাছে আর থাকব না ঠিক করেছি।

—তাই নাকি? উৎসুক এবং খুশী।—এই দ্বীপ ছাড়ার দরকার কি, কত মাইনে দেয় মালিক তোমাকে?

বললাম।

—মাত্র! ঠোঁট উল্টে দিল। তার বদলে এ-রকম মার-খোর। ...আচ্ছা, আমি যদি তার তিনগুণ মাইনে দিই তোমাকে, এখানে থাকবে? তুমি খুব বিশ্বস্ত লোক আমি একদিনেই বুঝে নিয়েছি, তাই...

টোপটা জোরালো করার জন্য মুখে খুশীর ভাব ফোটালাম একটু। লোভে পড়তে পারি সেই আঁচ দিলাম।

সোৎসাহে হেস্টার আর একটু সামনের দিকে ঝুঁকল।—তোমরা কবে যাচ্ছ এখান থেকে ?

না-জেনেও জবাব দিলাম, বোধহয় কাল—দলের সব তো চলে গেছে, আমরা তিনজনেই আছি শুধু।

—কে কে ? আরো বেশি উৎসুক।

—মালিক, সারা, আমি।

আর সকলে চলে গেছে ?

মাথা নাড়লাম। তাই।

আনন্দে দু'চোখ চক চক করে উঠল হেস্টারের।—আচ্ছা, সারা তোমাকে বিশ্বাস করে খুব।

আবারও মাথা নেড়ে জানালাম, করে।

—আচ্ছা, এক কাজ করতে পারো ? তিন গুণ মাইনের চাকরি তো দেবই, তাছাড়া নগদ হাজার পাঁচেক টাকাও দেব তোমাকে।...কববে।

—বলুন। মালিককে শিক্ষা দেবাব জন্য আমি সব করতে পারি।

—সারাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সন্ধ্যার পর একবার এদিকে নিয়ে আসতে পাবো ? যেখানে বলব সেখানে এনে দিতে পারলেই নগদ পাঁচ হাজাব টাকা।'

—কেন ?

—কেন জানো না ! তুমি কি বোকা নাকি ?

—সারাকে বিয়ে করতে চান ?

—বিয়ে !...আপত্তি ছিল না, বেশ মেয়েটা, কিন্তু বিয়েতে মা রাজী হবে না। তুমি তো নিজের লোক এখন, তোমাকে খুলেই বলি ব্যাপারখানা। বাবা মারা যাবার পর মায়ের মাথাটা কেমন গণ্ডগোল হয়ে যায়। অনেক চিকিৎসা-টিকিৎসা করার পর এখন একটু ভালো বটে, কিন্তু সাঙ্ঘাতিক রাগ। মাথায় কিছু চাপলেই হল।...বহুকাল আগে তোমার মালিক ওই মারভিন মায়ের ওপর খুব অত্যাচার করেছিল, ইয়ে, যাকে বলে পাশবিক অত্যাচার। মা আমাকে নিজের মুখে বলেছে, তার তখন ওই সারার মতন বয়েস। এতকাল বাদে

মারভিনকে দেখে গোঁ চেপেছে প্রতিশোধ নিতে হবে, মারভিনকে বুঝিয়ে দিতে হবে তার ছেলেও কম মরদ নয়।...এখন আমি পড়েছি ফ্যাসাদে, মা আমাকে পয়লা নম্বরের কাপুরুষ ভাবছে...মাথায় ওই রকম ভূত চাপে মাঝে মাঝে। তোমার কোনো ভয় নেই, মা যদি দেখে মারভিনের মেয়েকে আমি নিজের কবলে আনতে পেরেছি, তাহলেই হল—যা বলব তাই বিশ্বাস করবে, আসলে আমি মেয়েটার কোনো-রকম ক্ষতি করব না, বুঝলে ?

শুনে আমি স্তম্ভিত ভিতরে ভিতরে। দুনিয়ায় এমন পাগলও আছে জানা ছিল না। সারাকে একবার হাতের মুঠোয় পেলে এই ছেলেও ক্ষতি করবে কিনা সে-ও ভালোই অনুমান করতে পারি। জঙ্গলে যে মূর্তি দেখেছি ভোলবার নয়।

হেস্টার আবার বলল, তা ছাড়া তোমার মালিকের কিছু শাস্তিও প্রাপ্য। ওই চিঠিতে বার বার করে লিখেছে আজ সন্ধ্যার পর অতি অবশ্য মা যেন তার টেণ্টে যায়। এই বয়সে সে আবার বিয়ে করার জন্য ক্ষেপেছে।

মালিকের মেয়েকে কখন কোথায় পৌঁছে দিতে হবে বুঝে নিয়ে আমি উঠলাম। হেস্টার তক্ষুনি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে দিতে চেয়েছিল। আমি বলেছি সব একসঙ্গে নেব।

ফিরে দেখলাম, মারভিন উদগ্রীব মুখে তাঁবুর সামনের উঠোনে পায়চারি করছে। আমাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। দুই চোখ আমার মুখের ওপর চক্কর খেতে লাগল।

আমি সামনে আসতে হাত বাড়াল। চিঠির জবাবের প্রত্যাশা। বললাম, লিখে জবাব দেননি।

উগ্র দুচোখ আবার আমার মুখের ওপর থমকাল।—কি বলেছে ?

—আপনার চিঠি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে ঘষে বলেছে, তোমার মালিককে গিয়ে বল এই জবাব দিলাম।

স্তব্ধ খানিকক্ষণ। রাগে মুখটা তেলতেলে দেখাচ্ছে। ফেরার উদ্যোগ করতে আমি বললাম, তারপর তার ছেলে হেস্টার আমাকে

এতক্ষণ আটকে রেখেছিল।

মারভিন নিরীক্ষণ করে দেখল একটু। মারধোর করেছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করল। কিন্তু বোঝা কঠিন, কারণ ভিতরে বাইরে আমিও তেমনি ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত।

—কোথায়?

—তার অফিস-ঘরে।

লক্ষ্য করলাম, অদূরের তাঁবুর বাইরে সারা এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা কি প্রসঙ্গে কথা কইছি, অনুমান করতে চেষ্টা করছে।

মারভিন অসহিষ্ণু।—কেন? হেস্টার কি বলেছে?

—বলেছে, তার কাছে থাকলে আপনি যা দেন তার তিন গুণ মাইনে দেবে। আর একটা কাজ করে দিলে আজই নগদ পাঁচ হাজার টাকা গুণে দেবে।

মারভিনের মুখ লাল হয়ে উঠছে আবার। আরো বেশি তেলতেলে দেখাচ্ছে। ঝাঁঝিয়ে উঠল, কি কাজ?

—আপনার মেয়েকে সন্ধ্যার পর ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার হাতে পৌঁছে দিতে হবে। কোথায় তাও বলে দিয়েছে—

সঙ্গে সঙ্গে মারভিন ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। উন্মত্ত আক্রোশে দুহাতে আমার গলা টিপে ধরল।—নিমকহারাম, বেইমান! এতবড় অপমানের পর আজ মুখ বুজে থাকলি কেন, আজ তোর ছোরা বার হল না কেন?

ওদিকে থেকে সারা অস্ফুট আর্তনাদ করে ছুটে এলো।—ড্যাডি!

শক্ত হাতে মারভিনের হাত সরিয়ে গলা ছাড়িয়ে নিলাম। বললাম, এর থেকে অনেক বড় অপমানের ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছিল বলে সেদিন ছোরা বার হয়েছিল। আপনার সেটা সহ্য হয়নি।

থমকালো একটু। মেয়ের দিকে ঘুরল। থতমত খেয়ে আর সেই সঙ্গে হয়তো বা ঘাবড়ে গিয়ে সারা জেনট্রি ছুটে পালাল।

মারভিন আমার দিকে তাকালো আবার।—সেদিন কি হয়েছিল?

—আপনার মেয়েকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে গালে চড় পড়ল একটা '—বেয়াদপ। আমি তোকে জিজ্ঞাসা করছি—বলবি?

চোখে চোখ রেখে আমি স্থির তেমনি। এই নিয়ে একই কারণে তিনবার মার খেলাম। বললাম, ভালো করে মেরে নিন, এ-সুযোগ আর বেশি দিন পাবেন না। এই দ্বীপ ছাড়ার পর আপনার সঙ্গে আর আমার কোনোরকম সংশ্রব থাকবে না।

মালিক দাঁড়িয়ে রইল। আমি চলে এলাম। এ-রকম কখনো মুখের ওপর বলতে পারব ভাবিনি।...কিন্তু পারলাম।

নিজের তাঁবুতে বসে আকাশের দিকে চোখ গেল। গোটা উত্তরের আকাশ কালিবর্ণ। বড় রকমের একটা ঝড়-তুফানের সম্ভাবনা।... আমার বুকের তলায়ও কম ঝড় বইছে না।

আধঘণ্টা বাদে বাইবে লোকজনের কথাবার্তা আর কিছু পরিচিত শব্দ কানে আসতে উঠে দেখতে এলাম। মারভিনের তাঁবু ভাঙা হচ্ছে। কয়েকজন লোক এদিকে আসছে। এই তাঁবুও তোলার নির্দেশ। অর্থাৎ মালিক আজই রওনা হবে।

আমি খেয়াল করিনি। হয়তো জিপ নিয়ে বেরিয়ে নিজেই লোক ডেকে এনেছে। ট্রাকও হাজির একটা। ড্রাইভার লোকটা পরিচিত। এখানে ঘাঁটি করার সময়ও আমাদের মালপত্র বহন করেছে এবং মালিকের কাছ থেকে মোটা বখশিশ আদায় করেছে। এবারে তো দেড় দিনের লম্বা পাড়ি, অনেক মোটা লাভের আশা—কর্তার সঙ্গে যাবে বলেই আগের ব্যাচে যায়নি।

আমাকে দেখে সে এগিয়ে এলো। ঈষৎ চিন্তিত মুখ করে বলল, তোমার কর্তার খেয়াল আজই যাবে। হাজার তাড়াহুড়ো করলেও বেলা সাড়ে তিনটে চারটের আগে বেরুনো যাবে না। পথ এমনিতেই ভালো না, এ রাস্তায় লোকে সচরাচর হালকা মোটর নিয়েও বেরোয় না—সব ট্রেনে যাতায়াত করে। আমার অবশ্য সাহস আছে ঠিকই নিয়ে যাব, কিন্তু এত বেলায় বেরুলে তো রাস্তাতেই রাত হয়ে যাবে—বিশ্রাম নেবার মতো শিগগীর কোনো ভালো জায়গাও মিলবে না, তার

ওপর আকাশের অবস্থা মোটেই ভালো দেখছি না···কর্তাকে একটু বুঝিয়ে বল না, কাল খুব ভোরে রওনা হলেই সব দিক থেকে ভালো হয়।

আমি মাথা নাড়লাম।—আমি না, তুমি ট্রাক চালাবে, তুমি গিয়ে বল।

—বলেছিলাম তো। কানেই তুলল না। সাফ জবাব দিলে, বিশ্রামের দরকার নেই, রাতভোর চলতে হবে।

—তাহলে চলার জন্যে প্রস্তুত হওগে, বলে কিছু লাভ হবে না, মাঝখান থেকে মেজাজ খিঁচড়ে গেলে তোমার বখশিশে টান পড়বে।

তাড়াহুড়োর ফলে বেলা তিনটের মধ্যেই গোছানোর পাট শেষ। আকাশ আরো কালো। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারো। আমারও না। আমি মনে মনে একটু বিরক্ত এবং উদ্বিগ্ন অন্য কারণে। আজ সিংহ ছুটোর উপোসের দিন—ফাস্টিং ডে। সপ্তাহে একদিন উপোস বরাদ্দ ওদের। কাল কোথায় কখন ও ছুটোর খাওয়া জুটবে ঠিক নেই, আগে জানালে কিছু খাবার সঙ্গেই নিতে পারতাম। মরুক গে, আমার কি। খেয়ালের খেসারত যে দেবার সে দিক।

এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মালিকের সঙ্গে অনেকবার চোখাচোখি হয়েছে। রুক্ষ লাল মুখ। সদয় নয় একটুও, কিন্তু তার মধ্যেও ব্যতিক্রম একটু। এত কালের মধ্যে এই প্রথম যেন আমাকে ভালো করে লক্ষ্য করার কারণ ঘটেছে কিছু। লক্ষ্য সারা জেনট্রিও করছে। তার চোখে শুধু বিদ্বেষ। মনে হয়, আমি চলে আসার পর মেয়ের ওপর চড়াও হয়েছে এবং যা জানবার হুমকির চোটেই ওর কাছ থেকে টেনে বার করেছে।

অতএব অপরাধী আমি বই কি।

॥ পাঁচ ॥

কেবল পাহাড় আর জঙ্গল, জঙ্গল আর পাহাড়।

আমরা যেন জনমানবশূন্য এক প্রেত-ভূমির ওপব দিয়ে চলেছি। একদিকে আগাগোড়া জংলা পাহাড, অন্য দিকে কখনো গভীব জঙ্গল, কখনো বা গায়ে-কাঁটা-দেওযা গভীর খাদ। ভয়াবহ পথই বটে। ড্রাইভারের মুখে শুনলাম, এ-পথে মাসে দশ বিশটা গাড়িও যাতায়াত করে কিনা সন্দেহ—বৃষ্টির সময তো নয়ই।

সামনে মালিকের জিপ চলেছে। দূর-বিদেশেব যাত্রায নিজের গাড়ি সঙ্গে আনে না। যেখানে যায় সেখান থেকে ভালো অবস্থার সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি কিনে নেয় একটা। সফর শেষে সমুদ্রপাড়ি দেবার আগে সেটা আবার বেচে দেয়। দূর-প্রাচ্যে এসে এবার মোটব না কিনে জিপ কিনেছে। মারভিন নিজেই চালাচ্ছে। পাশে তার মেয়ে।

পিছনে মালপত্র।

আমাদের ট্রাক জিপেব তিরিশ গজ পিছনে চলেছে। ড্রাইভারের পাশে আমি বসে। তার বাড়তি লোক নেবার দরকার হয়নি, কারণ মোটব বা ট্রাক আমিও চালাতে জানি। দলভুক্ত হবার পর মালিক আমাকে এই একটা জিনিসই শিখতে দিয়েছে। আমাদের ট্রাকে মাল নেই, ট্রাকের সঙ্গে মজবুত করে বাঁধা খাঁচায় শুধু সিংহ ছুটো রয়েছে।

বিকেল গড়িয়েছে, সন্ধ্যা পেরিয়েছে, চারদিক নিকষ কালো। জোরালো হেডলাইট জ্বেলে চলেছি। জিপও তাই। জিপ আর ট্রাক ছুটোরই গতি মন্থর। রাতের অন্ধকারে এই পথে জোরে গাড়ি চালানো আত্মহত্যার সামিল।

তা সত্ত্বেও আচমকা মৃত্যুরই হাতছানি।

ছুপুর থেকে আকাশের যে সাজ চলছিল, এতক্ষণে তার তাণ্ডব শুরু। অন্ধকারের দরুন আকাশের অবস্থা আমরা ঠাওর করতে

পারছিলাম না। তবে অনেকক্ষণ ধরেই বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছিল। তাই আমরা আশা করছিলাম অঘটন কিছু ঘটবে না, আমরা নির্বিঘ্নেই এগোবো।

খানিকক্ষণ ঠাণ্ডা বাতাস দেবার পরেই শাঁ শাঁ শব্দ। তারপরেই ঝড়। প্রলয়। মৃত্যু যেন শ্যেনপাখির মতো এই প্রাণ ক'টা ছিনিয়ে নেবার জন্য ধেয়ে আসছে।

এ-পাশে পাহাড় ও-পাশে জঙ্গল এমনি একটা জায়গায় সামনের জিপটা থেমে গেল। গজ পনেরো তফাতে আমাদেব ট্রাকটাও। আর এগুনো সম্ভব নয় যখন, এ-রকম জায়গাতেই থামা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। খাদের পাশে অবস্থান ঢের বেশি বিপদজনক।

জিপ থেকে গলা বার করে মারভিন পিছনেব দিকে তাকাচ্ছিল। অর্থাৎ আমরা জায়গামতো থেমেছি কিনা দেখল।

ঝড়ের তাণ্ডব বেড়েই চলল। নিঃশেষ করবেই আমাদের। চারিদিকে কড়কড় মড়মড় শব্দ। পাহাড়ের গা থেকে পাথর খসছে, গাছ ভাঙছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। বাতাসের বেগে তার ঝাপটা ছুঁচের মতো চোখে-মুখে বিঁধছে। বাতাস আর বৃষ্টি যেন পরস্পরের সঙ্গে ক্ষিপ্ত উল্লাসে পাল্লা দিয়ে চলেছে। কাছে দূরে ধস নামার বিকট শব্দ। আমাদের ট্রাক বা সামনের ওই জিপ এখনো অক্ষত কোন মন্ত্রবলে জানি না। যে-কোনো মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যেতে পারে—সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে—যাবেই—মারভিন জেনট্রি, সারা জেনট্রি, ড্রাইভার, আমি টনি কার্টার, পিছনেব ওই সিংহ আর সিংহীটা—সব—সব।

আমার পাশে ড্রাইভার গলা ছেড়ে মারভিনের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে চলল। লোভ, লোভ—এবারে যদি প্রাণে বাঁচে তো জীবনে কখনো আর লোভের ফাঁদে পা দেবে না প্রতিজ্ঞা করল। তেজী সিংহ দুটো সেই থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ করে চলেছে। বাইরের হুলস্থুল তাণ্ডবে কান না পাতলে শোনা যায় না।

স্থির স্থাণুর মতো বসে আছি আমি। মৃত্যুর কথা ভাবছি?

জীবনের কথা ভাবছি ? না, কিছুই না ভাবতে চেষ্টা করছি।

…এই ঝড় আর থামবে কি ? থামল কিনা দেখার জন্য আমরা কেউ থাকব কি ? কারো কারো বেলায় শেষের সে-দিন কি ভয়ঙ্কর সুন্দর এ-কথাটা জানাবার আমাদের কেউ একজন অবশিষ্ট থাকবে কি ?

ত্রাসে চমকে উঠলাম। খুব সামনে একটা পাথর পড়ল। কিন্তু কোথায় পড়ল ? শব্দটা এ-রকম কেন ? তাহলে কি দুজনের হয়ে গেল ? সিংহ দুটোকে নিয়ে ছ'জন আমরা—তার মধ্যে দুজনের হয়ে গেল ?

নামলাম। ড্রাইভার আমার হাত চেপে বসিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। তার হাত ছাড়িয়ে নামলাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে সামনের জিপটার দিকে এগোলাম। দাঁড়ালে ঝড়ে কোথায় ঠেলে নিয়ে যাবে ঠিক নেই।

…আশ্চর্য ! আশ্চর্য বই কি। হাতে দুটো জীবন্ত মানুষের স্পর্শ। জীপ আড়াল দিয়ে জড়াজড়ি হয়ে বসে আছে।

—টনি ?

—হ্যাঁ।

মেয়ে বাপের বুকে মুখ গুঁজে আছে। দু'হাতের বেষ্টনে মারভিন একটা ভীত খরগোশকে আশ্রয় দিয়েছে যেন। বলল, বেঁচে গেছি, ওই পাথরটা সামনের এঞ্জিনের ওপর পড়েছে। সামনেটা গুঁড়িয়ে গেছে, আমাদের বিশেষ কিছু হয়নি।

মারভিনের গলার স্বর যেমন ঠাণ্ডা তেমনি মোলায়েম। আমি যেন তার বন্ধুগোছের কেউ। কিন্তু দু'দিন আগে তার হাতের চাবুকে আমার গায়ের চামড়া ফেটে চৌচির হয়ে গেছে আমি তা ভুলিনি। তার পরের চড় ক'টাও না। বললাম, বিশেষ কিছু হবার সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি।

সেটা মারভিনও জানে। কারও মুখে কথা নেই, একটু বাদে ড্রাইভারও হামাগুড়ি দিয়ে উপস্থিত। একলা থাকতে সাহসে কুলোচ্ছিল না সম্ভবত। যেখানে লোক বেশি সেখানে প্রাণের আশা।

মারভিনের গলায় ঠাণ্ডা রসিকতার সুর।—কেমন লাগছে?

রাগ আর চেপে থাকতে পারল না বেচারা ড্রাইভার। বলে উঠল, খুব চমৎকার! কেন, পই-পই করে বারণ করিনি? নিজের আত্মহত্যা করার সাধ, তার মধ্যে আমাদের নিয়ে টানাটানি কেন!

—শাট্ আপ! মারভিন জেনট্রির মালিকের মেজাজ এখনো। আমাদের দুজনের উদ্দেশ্যেই হুকুম হল, যায়গায় চলে যাও, সব এক সঙ্গে থেকে একসঙ্গে মরতে চেষ্টা করে লাভ কি!

আবার বুকে হেঁটে ট্রাকে ফিরে এলাম আমরা। ড্রাইভার গজ গজ করে উঠল, তোমার না হয় মনিব আমার কি! প্রাণে বাঁচলে মেজাজ বার করছি ওর।

বললাম, ওর সঙ্গে বন্দুক আছ রাগে হলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আপাতত নিজের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখো।

ড্রাইভার ঠাণ্ডা তক্ষুনি।

আমরা সকলেই বেঁচে আছি। কারো গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগেনি। উন্মত্ত রোষে প্রকৃতি নিজেকে সংহার করেছে, নিজেকে লণ্ডভণ্ড করেছে। আর শান্ত ভোরের আলোয় নিজের কাণ্ড দেখে যেন মিটি মিটি হাসছে।

চারদিকে তাকিয়ে আমরা স্তব্ধ! একদিকে পাহাড়, একদিকে জঙ্গল। মাঝখানে আমরা। জিপের এঞ্জিন গুঁড়ো-গুঁড়ো, পিছনের চাকা দুটো শূন্যে তুলে ওটা মুখ থুবড়ে আছে। সামনের রাস্তা অসংখ্য ছোট-বড় পাথর আর ভাঙা ডালপালায় ছাওয়া। গাড়ি ছেড়ে মানুষ চলাচলও অসম্ভব। তবু অবস্থা বোঝার জন্য আমরা যতটা সম্ভব পায়ে হেঁটে এগিয়েছি। তারপর থামতে হয়েছে। সামনের রাস্তায় বিশাল ধস।

ফিরে এসে আবার পিছন দিকটা দেখতে এগিয়েছি—যেদিক থেকে এসেছি সেই দিকটা। একই অবস্থা। এদিকেও একাধিক রাস্তা জোড়া ধস।

ব্যস্। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই।

রাত্রে ক' ঘণ্টা ড্রাইভ করার পর আমরা থেমেছিলাম হিসেব করে ড্রাইভার হতাশ মুখে জানালো, ধারে কাছে অর্থাৎ ষাট-সত্তর মাইলের মধ্যেও লোকালয় নেই।

সকাল আটটা বাজতে না বাজতে সিংহ দুটো গাঁইগুঁই শুরু করল, তাদের খাবার চাই। ক্রমে রাগ আর তর্জন-গর্জন বাড়তে থাকল ওদের। স্বাধীনতা হরণ করে ওদের খাঁচায় যখন পোরা হয়েছে, প্রকৃতির অঘটন ওরা বুঝতে চাইবে কেন?

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও জঠর জ্বলতে লাগল। কিন্তু আমাদের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা আছে। বিসকিট আছে, জ্যাম জেলি মাখন আছে, টিনের খাবার কিছু আছে, চা-কফিও আছে। ওল্‌টানো জিপ থেকে এগুলো বার করা হল। একটু খোঁজাখুঁজি করতে পাহাড়ী জলের নালাও মিলল একটা। অতএব আমাদের কয়েকটা দিন যোঝার মতো রসদ আছে। কিন্তু ওদের কি হবে, ওই অবুঝ পশু দুটোর?

আমরা যা খেলাম তারই কিছু দিয়ে ওদের ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করল মারভিন। চেষ্টাটা হাস্যকর, কারণ, যা আছে তার সব দিয়ে দিলেও চার ভাগের একভাগ খিদেও মিটবে না ওদের। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে হাস্যকর বলে কিছু নেই। খাঁচার ফাঁক দিয়ে মারভিন ওই সামান্য খাদ্য রাখা মাত্র হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে এলো জনোয়ার দুটো। শুঁকে বুঝতে চেষ্টা করল কি দেওয়া হয়েছে। ওই খাবার স্পর্শও করল না। রাগে গরগর করতে করতে আবার দূরে গিয়ে বসল। ওদের উদ্দেশ্যে গালাগাল করতে করতে মারভিন খাঁচার ফাঁক দিয়ে খাবারগুলো তুলে নিয়ে চলে গেল।

আমাদের কি আশা এখন?

একমাত্র আশা, বাইরের লোকালয়ের মানুষ আমরা বেঁচে থাকতে থাকতে যদি এসে উদ্ধার করে। যে-দল আগে চলে গেছে তারা যদি খোঁজখবর শুরু করে। কিন্তু খেয়ালী মালিককে চেনে সকলেই, হয়তো ভেবে বসে থাকবে পুরনো প্রণয়িনীর ফাঁদে পা দিয়ে মালিক মোটে

রওনাই হয়নি। সেখানকার প্রোগ্রামের তারিখ এগিয়ে এলে তখন হয়তো তাদের হুঁশ হবে। আর এক আশা যেখান থেকে আসছি সেখানকার অনেকেই জানে কোন্ দুর্যোগ মাথায় করে আমরা রওনা হয়েছি। তারা যদি তল্লাসীর ব্যবস্থা করে। কিন্তু তড়িঘড়ি চেষ্টা করলেও ক'দিন লাগবে এখান থেকে আমাদের উদ্ধার করতে?

বিকেলের মধ্যে সিংহ দুটোর ক্ষুধার্ত হাঁকডাকে কান ঝালাপালা। মারভিন বা আমাকে দেখলেই লাফিয়ে খাঁচার গায়ে এসে দাঁড়ায়। ভাবে এবার বুঝি ওদের খাবার দেব। তারপর গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বার করে আর দুই চোখে অভিযোগ নিয়ে দেখে আমাদের। একমাত্র জল ছাড়া কেন, আর কিছুই ওদের দেওয়া হচ্ছে না বুঝতে পারে না।

বিকেলে বন্দুক হাতে পাশের জঙ্গলে ঢুকল মারভিন। দুরাশা, যদি কিছু মেলে। একটা পাথরে ঠেস দিয়ে আর একটা পাথরে বসে আছে সারা জেনট্রি। ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে ওর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলার লোভ হচ্ছিল। সুযোগ পেয়ে সামনে গিয়ে বসলাম। মারভিন জেনট্রি যেমন করে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ঠিক তেমনি হালকা সুরে বললাম, কেমন লাগছে?

ও এখনো মনিব-কন্যা। এই অন্তরঙ্গ সুরটা অপছন্দ তাই। তার ওপর সেই রওনা হবার আগে থেকেই ভিতরে ভিতরে খাপ্পা আমার ওপর। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আমি বললাম, সব যখন একসঙ্গেই মাটি নেব এখানে আর রাগ রেখে লাভ কি। সেই মাটি নেবার মধ্যে মনিব-চাকর আর মনিবের মেয়ের কোনো তফাত থাকবে না।

ওর শুকনো মুখ দেখে দুই-একটা ভরসার কথা বলব বলে এসেছিলাম, অথচ বললাম কি। আমার মধ্যে হঠাৎ যেন একটা ক্রুর স্পর্ধা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। সারা আমার দিকে ফিরল।— শয়তানী করে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

হেসে বললাম, না না, ভয় কেন দেখাব, তুমি সাহসী মেয়ে, ভয়ের

কি আছে।

—কেন, বাইরে থেকে কেউ আসবে না, আমরা এইভাবেই থেকে যাব?

—আসবে বৈ কি, নিশ্চয় আসবে।···তবে কতদিনের মধ্যে আসবে, এসে আমাদের কি অবস্থায় পাবে—সেটাই কথা। আমি ভাবছি পায়ে হেঁটে কালই রওনা হয়ে যাব—যা থাকে বরাতে, এভাবে ইঁদুরের মতো মরতে ইচ্ছে করছে না।

সারা অমনি ফোঁস করে উঠল, তার মানে আমাদের এ অবস্থায় ফেলে তুমি পালাতে চাও! রোসো, বাবা এলেই আমি বলে দিচ্ছি।

আমি আবারও হেসে উঠলাম।—বলো···তোমার বাবা আর যাই হোক নিজেকে এখনো মনিব ভাবার মতো বোকা নয়। তার ব্যাগ-ভরতি টাকার নোট, কিন্তু সেগুলো চিবিয়ে খাওয়া যায় না। সিংহ দুটো খিদের জ্বালায় কেমন ছটফট করছে দেখছ না—ওই টাকার বাণ্ডিল দেখিয়ে কি ওদের ঠাণ্ডা রাখা যাচ্ছে?

কি বললাম বুঝল না হয়তো। মনে মনে বিলক্ষণ ঘাবড়েছে। বলে উঠল, এই বিপদের মধ্যে আমাদের ফেলে তোমার পালাবার মতলব! একটু কৃতজ্ঞতাবোধও নেই তোমার?

···তাই তো, ওর অভিযোগেই যেন সায় দিলাম।—কত পেয়েছি। তোমাদের কাছ থেকে আমি, সমস্ত গায়ে চাবুকের দাগ, উঠতে বসতে গালে ঠাস ঠাস চড়—অথচ কি অকৃতজ্ঞ আমি! হঠাৎ রাগ চড়ে গেল আমার, বললাম, তোমার বাবাকে তুমি যা খুশি বলতে পারো, আমি কেয়ার করি না—বুঝলে?

সারা চেয়ে রইল। আমি আবার বললাম, এই দুর্যোগের মধ্যে না পড়লেও আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যেতাম—এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলেও চলেই যাব—বেরুবার আগে তোমার বাবার মুখের ওপর বলেওছিলাম, এখন সাধ মিটিয়ে মেরে নিতে পারে, আর বেশি দিন সে-সুযোগ পাবে না—বুঝলে?

আমি এই সুরে এত কথা বলতে পারি সারার ধারণা ছিল না।

ভীত, আড়ষ্ট। বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে শুধু চেয়েই রইল।

মারভিন জেনট্রি খালি-হাতে ফিরল। জানা কথাই কিছু মিলবে না। কারো মুখে কোনো কথা নেই। ক্ষিদের জ্বালায় সিংহ দুটো শুধু এক-এক প্রস্থ গর্জন করে উঠছে। তারপর ক্লান্ত হয়ে থেমে যাচ্ছে।

রাত্রি। নিথর স্তব্ধ চারদিক।

পাথরে মাথা রেখে মারভিন দিব্যি ঘুমোচ্ছে। ঘুমোবে না কেন, ঘুমের রসদ আছে তার কাছে। রসদ বাঁচাবার জন্য রাতে শুধু জল আর দুটো করে বিসকিট ছাড়া আমরা কেউ কিছু খাইনি। এই রসদের ওপর ক'দিন নির্ভর করতে হবে কে জানে? মারভিন সাদা জল খায়নি, অনেকটা মদ মিশিয়ে খেয়েছে। আমাদেরও দিতে চেয়েছিল। ড্রাইভার নিয়েছে, আমি নিইনি।

আমার পাশে ড্রাইভার ঘুমোচ্ছে। আমার চোখে ঘুম নেই। খিদের জ্বালায় সিংহ দুটো অস্থির হয়ে উঠছে এক-একবার। কাল সমস্ত দিন উপোস গেছে ওদের, উপোসের পরদিন এমনিতেই খাবার জন্য আধা-পাগল হয়ে ওঠে ওরা। আজ ভগবানের মারে উপোস চলছে। কাল কি হবে জানি না, পরশু কি হবে জানি না, তরশু কি হবে জানি না, কবে কি হবে জানি না। ওদের গোঙানি যেন খচ-খচ করে আমার পাঁজরের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে।

উঠে পায়চারি করছিলাম। থমকে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে কে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। সারা জেনট্রি।

—ঘুমোওনি?

ও বলল, ঘুম আসছে না।...তুমিও ঘুমোওনি যে?

—সিংহ দুটোর জন্য। তোমার বাবার দোষে দু'দিন উপোস চলছে ওদের।

—বাবা কি করে জানবে আমরা এই অবস্থায় পড়ব?

—কাল রওনা হবেই আমাকে আগে থাকতে জানালে আমি ব্যবস্থা রাখতাম। তাছাড়া, আকাশের লক্ষণ দেখে ড্রাইভার তাকে সাবধান করেছিল।

সারা চুপ খানিকক্ষণ। বাবার একরোখা স্বভাব জানে। একটু বাদে আমাকে ঠাণ্ডা করার জন্মেই যেন বলল, বাবাও কি কম কষ্ট পাচ্ছে, ওই সিংহ ছুটোকে বাবা আমার থেকেও ঢের বেশি ভালোবাসে।

মিথ্যে বলেনি। সিংহ ছুটোর জন্মে মারভিনের চোখ-মুখে একটা নীরব যন্ত্রণা আমি লক্ষ্য করছি।

—তুমি কি সত্যি কাল চলে যাবে ?

আমি ভালো করে তাকালাম ওর দিকে। পরিস্থিতি বিশেষে মানুষ কত অসহায় কত দুর্বল, তাই দেখলাম চেয়ে চেয়ে। আমার অভিমান কমে আসছে, ক্ষোভ কমে আসছে। এত হেনস্থা সত্ত্বেও আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। ঈশ্বরের রাজ্যে এ শেখার মতো একটা পাঠ বটে। মাথা নাড়লাম। যাব না। বললাম, সকলে জীবন নিয়ে এখান থেকে উদ্ধার পেলে তারপর যাব। দাসত্ব আর করব না, তা বলে বেইমানী করে যাব না।

সারা বলল, উদ্ধার পেলে বাবাকে আমি বলব আর যেন কক্ষনো তোমার ওপর অত্যাচার না করে।

এইটুকুই অসহ্য লাগল। গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল। বক্র ঝাঁঝে বলে উঠলাম, থাক, অত করুণা সহ্য হবে না, ঈশ্বরের নাম নিয়ে নিজের ভাবনা ভাবগে যাও।

পরের রাত্রি।

সিংহ ছুটোর করুণ আর্তনাদে মাথা খারাপ হবার দাখিল আমার। আমরা তবু কিছু খাচ্ছি, তবু কিছু মুখে দিচ্ছি। কিন্তু ও ছুটো আমাদের খাবার স্পর্শও করছে না। আমরা পেটের জ্বালায় জংলা আগাছা সেদ্ধ করে নুন ছিটিয়ে খেয়েছি। কিন্তু বনের পশু প্রাণের দায়েও গোঁজামিল দিতে জানে না। ওছুটোর কাছে যেতে পারি না, ও ছুটোর দিকে তাকাতে পারি না। বড় বড় ছুটো চোখ মেলে ওরা যেন মানুষকে ধিক্কার দিচ্ছে।

ওদের জন্য মনিবের যন্ত্রণাও টের পাচ্ছি। থেকে থেকে তার চোখ ছুটো ক্রূর হয়ে উঠেছে। তারপরেই অসহায় দৃষ্টি। ওই চোখ দেখে

আমার বুকের তলায় অনাগত আশঙ্কা একটা। কিছু একটা ঘটতে পারে। নিদারুণ কিছু।

আবার রাত পোহালো। আবার দিন কেটে গেল। আমার মনে হল আমরা যেন কত যুগ কতকাল ধরে এখানে বন্দী। আমাদের রসদও নিঃশেষ। তবু আগাছা-সেদ্ধ পাতা-সেদ্ধ গলাধঃকরণ করে আর দু'চার দিন চলতে পারে। সারা এরই মধ্যে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। ড্রাইভারটা পাগলের মতো ভুল বকতে শুরু করেছে।

রাত্রি।

মারভিনের দিকে যতবার চোখ পড়ছে ততবার আমি চমকে চমকে উঠছি। সেই নিদারুণ কিছু ঘটার ছায়া এখন স্পষ্ট দেখছি। সিংহ দুটো জঠরের জ্বালায় আর সর্বক্ষণ দাপাদাপি হাঁকাহাঁকি করছে না। সেই শক্তি কমে এসেছে। কেবল আমাদের কাউকে দেখলে হুম হুম শব্দে গজরাতে থাকে—আমার মনে হয় ওদের অন্তরাত্মা আমাদের ধিক্কার দিচ্ছে।

মারভিনের দু-চোখ ভয়াল, ক্রূর, স্থির। রাতে ওদের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে যা বলল শোনা-মাত্র নিস্পন্দ কাঠ আমি। আমি যে শুনেছি মনিব তাও জানে না। বলল, কালকের দিনটা দেখব, তারপর আর তোদের কষ্ট দেব না।

একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় আমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগল। রাত বাড়ছে, সকলে ঘুমে। আমি পাগলের মতো পায়চারি করছি, আর এক-একবার খাঁচার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছি। দু'দিকের অন্ধকার কোণে ওরা নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে।

...আমি কে? টনি কার্টার কে? কতগুলো হাড়-মাংসের সাজানো স্তূপ একটা? তা ভিন্ন আর কি? এর মধ্যে প্রাণ বলে কিছু আছে কিনা কেউ দেখেছে তাকিয়ে? একজনও দেখেছে? না, রক্ত-হাড়-মাংসের এই কাঠামোটা শুধু অপরের প্রয়োজনের ক্রীতদাস। তাদের স্বার্থের প্রয়োজন মেটাবে।...তাহলে? তাহলে তার থেকে

আরো অনেক বড় অনেক ভয়ঙ্কর প্রয়োজন মেটাতে পারে না? পারে না?

ঈশ্বর! আমাকে শক্তি দাও!

ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে আছে। নড়তে পারলাম না। কে যেন জোর করে ধরে রেখেছে আমাকে। আমি তাকে দেখছি। সে-ও আমি। যে-আমিটা ক্রীতদাস নয়।

আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?

ঈশ্বর! সকলে বলে তুমি করুণাময়, করুণা করে তুমি আমাকে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত বদ্ধপাগল করে দাও।

ঈশ্বর আমার কথা শুনল।

চাবিটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে খাঁচার সামনে দাঁড়ালাম। খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম উল্টো মুখো হয়ে সিংহ দুটো ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। একটুও শব্দ না করে তালা খুললাম। না, ওরা টের পায়নি, তেমনি পড়ে আছে। আস্তে আস্তে ল্যাচ্‌টা তুললাম। সংকটতম মুহূর্ত এইবার। চোখের পলকে লোহার শিকের দরজাটা ফাঁক করে ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে ল্যাচ্‌ ফেলে দিতে হবে—নইলে একমাত্র মারভিন ভিন্ন ওদের হাতে বাকি কজনের মৃত্যু অবধারিত।

ঈশ্বর আর একটু শক্তি দাও! আরো একটু পাগল করে দাও!

মুহূর্তের মধ্যে কি হয়ে গেল জানি না।

আমি খাঁচার ভিতরে। দরজা বন্ধ। ল্যাচ্‌ ফেলতে পেরেছি।

পরক্ষণে বিকট হুঙ্কার, বিকট গর্জন, ক্ষুধার্ত পশুর চরম প্রাপ্তির উল্লাস।

আমি প্রাণপণে চোখ বুজে ফেললাম। ঈশ্বর…!

আমার দু'কাঁধে দুটো থাবার ভার। সেই সঙ্গে কান-ফাটানো গর্জন। আর সেই মুহূর্তে খাঁচার ওপর দূর থেকে এক ঝলক টর্চের আলো, আর মানুষের আর্ত চিৎকার, ট-নি-ই-ই!

আমার গায়ের রক্ত সিরসির করে নেমে যাচ্ছে। দু'দিক থেকে দুটো পশু আমার কাঁধের ওপর থাবা তুলে দাঁড়িয়ে গেছে। মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোঁ-গোঁ করছে। কিন্তু আশ্চর্য, আমাকে ওরা কষ্ট দিচ্ছে কেন? ফালা ফালা করে ফেলছে না কেন? খাচ্ছে না কেন?

টর্চ হাতে ছুটে এসেছে মারভিন। পরমুহূর্তে এই দৃশ্য দেখে বোবা পাথর।

আরো বার কয়েক হুমকি ছেড়ে কাঁধ থেকে থাবা নামিয়ে পশু দুটো রাগে গরগর করতে করতে আবার স্বস্থানে ফিরে গিয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। যেন বুঝিয়ে দিল, খেতে না দিয়ে এ-ধরনের রসিকতা ওদের পছন্দ নয়।

আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে। দরদর করে ঘামছি। চোখের জল গাল বেয়ে নেমে আসছে।

ঈশ্বর! ঈশ্বর! এ তুমি কি খেলা দেখালে! এই দুটো হাতে করে ক'টা দিন ওদের খেতে দিয়েছি বলে ক্ষিদের জ্বালায় মরতে বসেও ওরা এত কৃতজ্ঞ!

—টনি! মারভিনের হুঁশ ফিরল যেন এতক্ষণে।—ইউ ব্লাডি ফুল! বেরিয়ে আয়—শিগগির বেরিয়ে আয়!

আমি সামনে এগিয়ে এলাম। টর্চ জ্বেলে রেখেছে। দেখলাম উত্তেজনায় কাঁপছে মারভিন।

বললাম, ওদের ক্ষুধা মেটাতে এসেছিলাম, ক্ষিদে মিটিয়ে তোমার বন্দুকের হাত থেকে ওদের বাঁচাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা আমাকে খেল না।...তুমি ওদের মারবে কেন, তোমার মতো পেটের নাড়ি ভেবেছ ওদের? চার দিন উপোসের পরেও হিম্মত দেখছ না?

মারভিন চেয়ে রইল আমার দিকে। খানিকক্ষণের জন্য বোধহয় ভুলে গেল আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। তারপর সচকিত।—বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় শিগগির!

বেরিয়ে এলাম। ল্যাচ্ ফেললাম। তালা বন্ধ করলাম। এবারে একটু শব্দ হতে সিংহ দুটো বিরক্ত। গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বার করে

অন্যদিকে ঘাড় গুঁজল।

আমার একটা হাত বগলদাবা করে মারভিন হিড়হিড় করে নিজের ভূমিশয্যার কাছে টেনে নিয়ে এলো। কাঁধে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল। ঘাড়ে কাঁধে টর্চ ফেলে দেখল কোথাও আঁচড়-টাচড় লেগেছে কিনা। তারপর নিজে বসল। টর্চটা পাশে জ্বলছে হুঁশ নেই। মুখ ঘামে ভেজা তখনো।

চেয়ে আছে আমার দিকে। ··একটু ব্র্যাণ্ডি খাবি? খা না, এখনো আছে খানিকটা·—

আমি মাথা নাড়লাম। দরকার নেই।

নিষ্পলক চেয়েই রইল।

···যদি এখান থেকে উদ্ধার পাই, (আমার মন বলছে পাব, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমার মনে ভালো মন্দ দুইয়েরই ছায়া পড়ে—ভালোর পূর্বাভাস এ-পর্যন্ত জীবনে কম দেখেছি সেটা সত্যি।) আমি ফ্র্যাংকি বোমারকেও একটু ফুর্তির রসদ জোগাতে পারি। বোমার অপরকে হাসিয়ে মারে নিজে হাসে না। কিন্তু একটা খবর দিলে হাসবে, বলবে ওই দুর্যোগের ফাঁকে তোর কাঁধে পাহাড়ের পরী এসে ভর করেছিল।···যদি আমি বলি মারভিন জেনট্রির চোখে আমি জল দেখেছি, আর যদি বলি, বড় বড় চোখ দুটো যখন জলে চকচক করছিল, তার রুক্ষ মুখখানা তখন প্রায় সুন্দর গোছের দেখাচ্ছিল।

মারভিন চেয়েই আছে। টর্চটা জ্বলছেই। আমার পাশেই হাতের নাগালের মধ্যে সারা ঘুমোচ্ছে। তার বুকের ওঠা-নামা চোখে পড়ছে। ভালো-লাগারও এক ধরনের অস্বস্তি আছে। মনিব, মনিব-কন্যা দুজনার দরুনই অস্বস্তি। টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে উঠতে গেলাম।

তারপর কি যে কাণ্ড হয়ে গেল, নিজেই বিমূঢ় আমি।

···বিমূঢ় শুধু আমি কেন, সে-দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠেছিল সারা জেনট্রিও। দু'চোখ কপালে তুলে ও নিজেই বলেছে সে-কথা। কোন বিপদের মধ্যে আমরা পড়ে আছি খানিকক্ষণের মধ্যে তাও ভুলে গেছল বোধহয়।

ওর সে-বিস্ময় আমি কল্পনা করতে পারি। কারণ খুব সকালে ঘুম ভাঙতে নিজেরই প্রাণান্ত দশা। দেখি মারভিন জেনট্রির লোমশ বুকে মুখ গুঁজে আমি পড়ে আছি, আমাকে দিব্যি পাশবালিশ বানিয়ে সে ঘুমোচ্ছে।

পাশে সারা নেই। শরীরটা যত সম্ভব গুটিয়ে তার বাহুবন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করতেই মারভিন ঘুম-চোখে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, নড়বি তো খুন করব, শুয়ে থাক চুপ করে।

...মারভিনের চোখে তবু রাতদুপুরে জল দেখেছিলাম, আমার চোখে যে দিনের বেলায় জল আসি-আসি করছিল এ-কথাটা বোমারকে আর বলাই যাবে না।

ঝটকা মেরে উঠে পালালাম। মারভিন বিড়বিড় করে গালাগাল দিতে দিতে পাশ ফিরে শুলো।

ট্রাকের ও-ধারে খানিকটা দূরের পাথরে সারা বসে আছে। আমাকে দেখেই সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়াল। ওর কাছে যাওয়ার তর সইল না, নিজেও এগিয়ে আসতে লাগল।

—কি ব্যাপার ?

বোকা-বোকা মুখ করে আমি জিজ্ঞাস করলাম, কি ?

—ঘুম ভেঙে দেখলাম আমার পাশ ঘেঁষে বাবা আর তুমি জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছ।

বললাম, কি কাণ্ড, দুশ্চিন্তা আর ক্ষিদের জ্বালায় স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছ বোধহয়।

—স্বপ্ন দেখেছি ? তুমি এখন কোত্থেকে উঠে এলে ? পাশেই তোমাকে দেখে আমি আঁতকে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম।

আমার হাসি পাচ্ছে। বললাম, কাল রাতে ভূতে পেয়েছিল।

যে অবস্থায় দেখেছে আমাকে, সারার পক্ষে সবই বিশ্বাস করা সম্ভব। আঁতকে উঠল।—কখন ? কাকে ?

মাঝরাত্তিরে। আমাকে।

এখানে আবার ভূত আছে নাকি ?

যে পাহাড় আর জঙ্গল, ভূতের পক্ষে নিরাপদ জায়গাই তো…।

দিনের বেলাতেই তাকিয়ে নিল একবার।—তারপর ?

তারপর আমি ভয় পেতে তোমার বাবা আমাকে নিজের কাছে এনে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকল।

বাবার মাথা খারাপ, নইলে আমার পাশে—

শেষেরটুকু অনুক্ত থাকল। ভয়টাই প্রবল।—আবারও তো রাত্রি আসবে, তখন…?

লোভের উসখুসুনি। বলতে ইচ্ছে করল, গেল রাতের মতোই পাশাপাশি থাকব। হাজার হোক মনিব-কন্যা, বলা গেল না। বললাম, দেখো না, রাত্তির না-ও আসতে পারে।

কেন বললাম জানি না।

সিংহ দুটো থেকে থেকে হুমকি দিচ্ছিল। কিন্তু ওদের গলার আওয়াজ বেদনার্ত করুণ। সারা বলল, ও দুটো মরবেই, চারদিন হয়ে গেল শুধু জলের ওপর আছে।

আমার মুখ দিয়ে আবারও কথা বেরুলো—মরবে না, মরার নাটক এ-রকম হয় না, দেখো না—

ও কিছু বুঝল না। অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। …এ কথাই বা আমি কোন বিশ্বাসে বললাম তাও জানি না।

ঘণ্টাখানেক বাদে মাথার ওপর গোঁ গোঁ শব্দ। আমাদের সকলের হৃৎপিণ্ডগুলো যেন একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে সেই শূন্যে ছুটল। আনন্দে আমরা পাগলের মতো লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দিলাম।

আমাদের মাথার ওপর চক্রাকারে হেলিকপ্টার ঘুরছে। আনন্দের ধাক্কায় সারার মাথা খারাপ হবার দাখিল। হাতের কাছে আমি, আমাকেই জড়িয়ে ধরল। তারপর সামলে নিয়ে সকোপে তরল ঝাঁঝ ফোটালো মুখে, ইউ রাস্‌কেল !

ওপর থেকে খাবার পড়তে লাগল। আমরা ছোটাছুটি করে কুড়োতে লাগলাম। একটা জিনিসই আমি খুঁজছি।…নিশ্চয়ই পাব।

বোমার তো জানে শুধু আমরা নই, জানোয়ার দুটোও উপবাসী আছে।

পেলাম। যা বিশ্বাস করব তাই যেন পাবার দিন আজ। মস্তবড় টিনের প্যাকিংটা মাটিতে পড়েই থেঁতলে গেল। খোলার জন্য আর ধস্তাধাস্তি করতে হল না। সেটা নিয়েই খাঁচার দিকে ছুটলাম আমি।

···হতচ্ছাড়া আর হতচ্ছাড়ীটা এমন থাবা মেরে খাবার ছিনিয়ে নিল যে আমার হাত দুটো ছড়ে গিয়ে বক্তাক্ত। মারভিন কাছেই ছিল। দেখে বলল, বেশ হয়েছে। তারপরেই যে কাণ্ড করল, দেখে তার মেয়ের দুচোখ ছানাবড়া। দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে দু-গালে অন্তত পাঁচ-পাঁচটা ঠাস-ঠাস করে চুমু খেল তার পাগলা বাপ মারভিন জেনট্রি।

আনন্দে বাবার মাথার ঠিক নেই ছাড়া আর কি ভাববে?

॥ ছয় ॥

জীবনের চাকা ঘুরছে। কিন্তু তার ছন্দ বদলেছে।

সেটা এত স্পষ্ট যে সকলের চোখে বিস্ময়, সকলের চোখে কৌতূহল।

আমরা মেনল্যাণ্ডে ফিরেছি। এবার ঘুরতে ঘুরতে ভারতের দিকে এগোবার কথা। কিন্তু বোর্নিওর উত্তরাংশে থাকতেই মালিকের হাব-ভাব-আচরণে একটা বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে সকলে। পরিবর্তনটা অনেক সময় পাগলামির মতো মনে হয়েছে। সকলে ভেবেছে, সন্থ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে বলেই মেজাজের এই রকমফের। সর্বব্যাপারে আগের মতোই রুক্ষ হবার চেষ্টা, কিন্তু তার তলায় তলায় যেন লাগাম ছাড়া প্রশ্রয়ের স্রোত বইছে।

কারণে অকারণে আমার দিকে চেয়ে থাকে, হাসে মিটিমিটি, কাছে ডাকে, আগে বাবা আর মেয়েই একসঙ্গে খেত শুধু, এখন দু'বেলাই আমি তাদের সঙ্গী। মেয়ে অবাক চোখে আমাকে দেখে চেয়ে চেয়ে।

বোমার আমাকে বলে, কি রে, পাহাড়ে পাঁচদিন আটকে রেখে কর্তাকে জাদু করলি নাকি? তোর যেন ভাগ্য ফিরে গেল মনে হচ্ছে?

ভাগ্য ফেরার মুখ্য কারণটা ওরা সকলেই শুনেছে তারপর। মদের ঝোঁকে মারভিন প্রথম মেয়েকে বলেছে। সারা আমার কাছে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করেছে, ওই পাহাড়ে সিংহ দুটোর ক্ষিদের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তুমি নাকি রাত দুপুরে ওদের খাঁচায় গিয়ে ঢুকেছিলে?

—কে বলল?

—বাবা। আমি তো কিছু টের পাইনি।

—কেন. তার পরদিনই তো তোমাকে বললাম, রাতে ভূতে পেয়েছিল।

—ও···এই ভূত! কিন্তু আশ্চর্য, সারা শিউরে উঠল, সিংহ দুটো অত ক্ষিদের মুখেও তোমাকে খেল না!

বললাম, খেয়ে একেবারে শেষ করেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।

ঠাট্টা ভেবে সারা কান দিল না। বলে উঠল, এই জন্যেই বাবার একেবারে চোখের মণিটি তুমি। আমি দিনকে দিন হাঁ হয়ে যাচ্ছিলাম, বেরুবার দিনও চড় মেরে যে-লোক গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিল, সে হঠাৎ এ-রকম বদলে গেল কি করে।

—মিছে কথা বলো না, আমার এই পালিশ করা গায়ের রঙে কোন দাগ ফোটে না।

সারা হাসতে লাগল।

কি ভেবে আমি আবার বললাম, আগে চাবুকের চোটে গায়ের চামড়া ফেটে গেল তোমার জন্যে—পরে আবার ওই চড় খেতে হল তোমারই জন্য।

সারা উৎসুক, কেন, আমার জন্য চড় খেতে হল কেন?

—আগে চাবুক খেয়েছিলাম হেস্টার জেরোমকে ছোরা দেখিয়েছিলাম বলে, পরে মার খেলাম ওকে ছোরা দেখাইনি বলে।

না, লোভ সামলাতে পারিনি। ডরোথি জেরোম আর তার ছেলের পাগলামির কথা আর মতলবের কথা সারাকে বলেছি। শুনে মুখ লাল

সাবার। মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছে, মিথ্যে কথা, নিজের কদর বাড়াবার জন্য তুমি নিশ্চয়ই বাবার কাছে বানিয়ে বলেছ!

আমি প্রতিবাদ করিনি। বরং হাসতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু মনের তলায় আঁচড় পড়েছে। মনে হয়েছে ওই উদভ্রান্ত ছেলেটার প্রতি সাবার এখনো ভিতর ভিতরে একটু টান আছে।...থাকলেই বা, আমারই অগোচরের লোভ আমাকে কোন দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে?

সিংহের খাঁচায় ঢোকার খবরটা বোমা। সারার মুখে শুনেছে। বোমারের কাছ থেকে অন্য সকলে। একটা চোখ বুজে আর এক চোখ দিয়ে বোমার ঘটা করে দেখেছে আমাকে—তুই দেবদূত না শয়তান রে, অ্যাঁ! এই করে মালিকের মুণ্ডু ঘুরিয়েছিস!

আমি বলেছি, শয়তান। মওকা পেলে তোমারও ঘাড় মটকাবো।

মেনল্যাণ্ডে এসে সকলকে আশাতীত পুরস্কার দিয়েছে মারভিন। এদিক থেকে দরাজ হাত বরাবরই। কিন্তু খুশীর পুরস্কার কোনদিন কারো বরাতে জোটেনি। সফরের মোটা লাভ সব বিলিয়ে দিয়েছে—ওই দুর্যোগ থেকে দলের লোকের চেষ্টায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে তারই প্রতিদান।

সকলে পেয়েছে। শুধু আমি ছাড়া।

অথচ সবারই সব থেকে বেশি কৌতূহল আমার প্রতি। আমি কি পেলাম। কত পেলাম। না, এদিক থেকে কিছু পাইনি বলেই আমার বুকের তলায় সারাক্ষণ কি এক অদ্ভুত অনুভূতির দাপাদাপি। সুখের প্রলেপ-মাখানো আশঙ্কাও কি যেন। কারণ গত দুটো মাস ধরে আমি কি যে পেয়েছি কত যে পাচ্ছি সারাও জানে না—অন্যেরা তো নয়ই। ভিতরে বাইরে এক নিঃসঙ্গ মানুষ হঠাৎ যেন ছেলে পেয়েছে একটা—সর্বদিকে নির্ভরযোগ্য ছেলে। সন্তান যেন সারা নয়, আমি। কোথায় কোন ব্যাঙ্কে তার কত টাকা আছে সে-সব বই আর হিসেবপত্র আমাকে দেখিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কত খরচ, এমন কি কে-কত মাইনে পায় তাও আমাকে জানতে হয়েছে। এর

উন্নতির জন্য মনে মনে আরো কি কি পরিকল্পনা আছে—কাগজ-কলম নিয়ে আমাকে জানতে বুঝতে হয়েছে। এক-একসময় আমাকে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখলে আগের মতোই মেজাজ বিগড়োয়। চড়-চাপড় লাগাতে গিয়েও সামলে নিয়ে হেসে ফেলে, ইউ ফুল। আমার কথা কানে যাচ্ছে?

মেনল্যাণ্ডে পা দেবার দিন কতকের মধ্যে এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল আমার। তারপর হুকুম হল, রোজ সকালের দিকে ঘণ্টা দুইয়ের জন্য তার কাছে যেতে হবে। পরে জানলাম, সে আমাব মাস্টার। কিছু লেখাপড়া শিখতে হবে, অ্যাকাউন্টস শিখতে হবে, ইত্যাদি।

এর পরেও বুকের তলায় আমার আশা-আশঙ্কা দাপাদাপি না-করাটাই বিচিত্র।...হ্যাঁ, ভালো-মন্দ দুইয়েরই অনাগত আভাস আমার মনের তলায় দোল খেয়ে যায়। এর নাম ষষ্ঠ চেতনা কি না আমি জানি না। এখন মনের তলায় যে-সম্ভাবনা সংগোপন নিভৃত থেকে ঠেলে এগিয়ে আসতে চাইছে—তারই প্রকোপে আমার বুক দুরু দুরু সর্বদা।

বোমার শুধোয়, কর্তা তোকে কি দিল বল না?

আমি বলি, কিছু না।

আমি কিছু পাইনি বলে বোমারের বিস্ময় যেমন, অস্বস্তিও তেমনি। ক্ষ্যাপা মানুষের মতি-গতির কথা কে জানে, হয়তো দেবেই না কিছু। তাই সান্ত্বনা দেবার মতো করে বলে, কর্তা নিশ্চয় মজা করছে তোকে নিয়ে, দেখছে তুই মুখ ফুটে কিছু চাস কিনা, আসলে নিশ্চয় সকলের বেশিই দেবে তাকে।

আমার বুকের ভেতর কাঁপুনি কেন? বলে ফেললাম, তাই হবে বোধহয়...

অবাক মুখ করে সারাও এসে বলেছে, বাবা সকলকে দিল, শুধু তোমাকেই কিছু দিল না শুনলাম?

আমি মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ দিল না তো...।

—সেকি! একবার খাঁচায় ঢুকে বাজী মাত করেছ, আমি তো ভাবলাম তোমাকেই সব থেকে বেশি দেবে।

ও কাছে এলে আজকাল আমার এমন লাগে কেন? আকাশের চাঁদ হাতের নাগালের মধ্যে এমন অসম্ভব অনুভূতিও মনের তলায় তোলপাড় করে কেন?

জবাব দিয়েছি, কেনই বা দেবে আমাকে পুরস্কার, আমি তো আর বিপদ থেকে উদ্ধার করিনি, নিজেই উদ্ধার হয়েছি।

মুখখানা মনিব-কন্যার মতোই ভারিক্কি করে ও বলল, তাহলেও সকলকে দিয়েছে তোমাকেও দেওয়া উচিত। আমি বাবাকে বলব'খন—

চিন্তার ছায়া টানলাম মুখে, তুমি বললে যদি আবার অনেক বেশি দিয়ে দেয়?

আমার দুশ্চিন্তার বহর দেখে সারা হেসে ফেলল।—সে-জন্যে তোমার ভয় করছে নাকি?

আমি মাথা নাড়লাম, ভয় করছে।

…তারপর ঘোষণা নয় তো, যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ একটা। একজন রাগে ফেটে পড়ল, বাদ বাকি সকলে বিস্ময়ে।

প্রতিষ্ঠানের মালিক মারভিন জেনট্রির একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে। বিয়ে এই প্রতিষ্ঠানেরই ক্রীতদাসতুল্য একজনের সঙ্গে, যার নাম টনি কার্টার। সারা জেনট্রি সারা কার্টার হবে।

ঠিক যেমন করে আর পাঁচটা হুকুম করে মারভিন জেনট্রি, মেয়েকে ডেকে সেই গোছেরই হুকুম করল। বলল, সে যেন বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয়, তার শরীর খুব ভালো যাচ্ছে না, তাই বিয়েটা শিগগিরই দিয়ে দেবার ইচ্ছে।

শরীর কেমন ভাল যাচ্ছে না সকলেই জানে। মদের মাত্রা তার দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। একটু সামলে-সুমলে চললেই ভালো থাকতে পারে। কিন্তু ডাক্তারের কথায় কান দেবে না। তবে লোকটা মদ খেলে আগের মতো অত ভয়াবহ হয়ে ওঠে না এটুকুই যা তফাত।

সেদিন এ নিয়ে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। দেখে সারাও হকচকিয়ে গেছল সত্যি কথাই। তার বাবা সেই থেকে মদ খাচ্ছিল, একসময় বোতল শূন্য। মেজাজ বিগড়োল। হাঁক পাড়ল, টনি—।

কাছে আসতেই বলল, আমার বোতল থেকে আজকাল কেউ মাল সটকাচ্ছে, নইলে ঝটঝট এ-রকম ফুরোয় কি করে?

আমি নিরুত্তর।

বিরক্তি বাড়ল।—হাঁ করে দেখার কি আছে, একটা বোতল চাই।

ইদানীং তার সব-কিছুর চাবিই আমার কাছে। বললাম, আর বোতল নেই।

—নেই! নেই মানে?

আমি নিরুত্তর। সারা সভয়ে আমাকে দেখছিল, ভাবছিল কপালে না জানি কি আছে আমার।

মনিব গর্জে উঠে টেবিল চাপড়ে বলল, এক্ষুনি এখানে বোতল চাই, এ ফ্রেশ্ অ্যাণ্ড ফুল বটল—নইলে খুন হয়ে যাবে বলে দিলাম।

আমি গম্ভীর মুখে চলে গেলাম। তারা দুজনেই ধরে নিল আমি মদের বোতল আনতে গেলাম। কিন্তু তার বদলে যে জিনিসটি এনে সামনে রাখলাম দেখে প্রথমে দুজনেই হতভম্ব।

মনিবের সেই চাবুকখানা।

মারভিন ফেটে পড়ল, হোয়াট ইজ্ দিস?

আমি সবিনয়ে জবাব দিলাম, খুন করবেন বললেন যে।

সারা ভয়ে তটস্থ। মনিব হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। চাবুকটা তুলে নিয়ে শপাং করে টেবিলের ওপরেই এক ঘা বসাল। সঙ্গে সঙ্গে সে কি অট্টহাসি। থামেই না আর। শেষে মেয়ের দিকে ফিরে বলল, ছাখ্, দেখে রাখ্, মোর ডেঞ্জারাস্ ছান লুই অ্যাণ্ড্ লিও, তোর কপালে কি আছে কে জানে।

বাপের এই পরিবর্তন দেখে মেয়ে অবাক হয়েছিল। যা বলল, নেশার ঝোঁকে বলেছে ধরে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে হেসেও ছিল। তিন দিন না যেতে ওকে ঘরে ডেকে এই হুকুম।

সারা আকাশ থেকেই পড়ল।—বিয়ে! আমি করব! কাকে?

—কেন, টনিকে।

আমি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি দূরে সরে যেতে চেষ্টা করলাম। পারা গেল না, পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে আছে।

সারার মুখের সে বিস্ময় আমার বুকে মুগুরের মতো বেজে চলেছে। ওর মাথায় ভালো করে ঢুকছে না কিছু।—টনি...মানে আমাদের টনি?

হ্যাঁ, আমাদের টনি। টনি কার্টার তুমি মিসেস টনি কার্টার হতে যাচ্ছ।

তারপরেও সারা হাঁ করে বাপের মুখের দিকে চেয়ে আছে। দিনে-দুপুরে মদ গিলে মত্ত অবস্থা কিনা বুঝতে চেষ্টা করছে তারপর চেঁচিয়ে উঠেছে, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে বাবা?

মারভিন তেতে উঠল, ডোণ্ট বি ইম্‌পার্টিনেণ্ট্‌, যা বললাম তাই হবে, টনি কার্টারের সঙ্গে তোমার বিয়ে—

—না না না! মেয়ে ক্ষেপেই উঠল, তোমার মাথার ঠিক নেই, তুমি পাগল হয়ে গেছ, ছি ছি ছি, একটা ইয়ের সঙ্গে না, কক্ষনো না, কক্ষনো না।

ছিটকে বেরিয়ে এলো। সামনে আমি। নির্বাক ঠাণ্ডা। দু'চোখে ঘৃণা আর বিদ্বেষ উপছে পড়ছে তার। আমার মুখটাও একদফা ঝলসে দিয়ে ছুটে চলে গেল।

বিকেলে একপ্রস্থ বাপ-মেয়েতে কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল। রাগে ক্ষোভে মেয়ে যা-খুশি তাই বলতে লাগল। বাপকে ডাক্তার দেখাতে বলল, আমার উদ্দেশ্যে গালাগাল ছুঁড়ল।

মারভিনের এক শাসানি। কথার অবাধ্য হয়ো না, আমি যা ঠিক করেছি তার নড়চড় হবে না—অবাধ্য হলে বিপদ হবে।

সন্ধ্যার মধ্যে অনেককেই সুসংবাদটা জানিয়ে দিল মারভিন জেনট্রি। তাদের প্রতিষ্ঠানের ভাবী কর্তা আমি টনি কার্টার—তার জামাই। শিগগিরই বিয়ে হবে, উৎসব হবে, এবং সকলে মনের সাধে

আনন্দ করার সুযোগ পাবে। শুনে সকলে সারার মতোই বিমূঢ় প্রথম, অর্থাৎ, কে টনি কার্টার, আমাদের টনি…? তারপর মানুষটার মত্ত অবস্থা কিনা, ক্ষেপে গেল কিনা সেই সংশয়। তারপরেও মুখ চাওয়া-চাওয়ি। বিশ্বাস করবে কি করবে না জানে না। ভাগ্যের এমন ওলট-পালটও হয় কখনো!

ফ্রাংকি বোমারও হাঁ। চোখাচোখ হলেই এক চোখ বুজে ঘটা করে দেখছে আমাকে।

এর পর সত্তেরো বছরের একটা মেয়ের সে-কি হিংস্র মূর্তি। বাপের মন টলাতে না পেরে আমার উপরেই আবো ক্ষেপে গেল। চোখে মুখে ঘৃণা আর বিদ্বেষ ঠিকরে পড়ছে বার বার ঝলসে উঠতে লাগল, তুমি একটা স্কাউণ্ড্রেল, সিংহ খাবে না জেনেও বাবার মন ভুলোবার জন্য খাঁচায় ঢুকেছিলে, বাবাকে তুমি ওষুধ দিয়ে বশ করেছ। তোমাকে আমি মজা দেখিয়ে ছাড়ব - তোমাকে আমি শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব—বুঝলে?

মোলায়েম মুখ করে জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়ের পরে তো?

—কি? এত আস্পর্ধা তোমার! বাবার মাথাটা খারাপ করে দিয়ে ভেবেছ সব হয়ে গেল? তোমার ওই জিভ আমি টেনে ছিঁড়ব, কুকুর দিয়ে খাওয়াব!

রাতে কর্তাকে বেশ খোশমেজাজে পেলাম। বোতলে মদের পরিমাণ দেখেও তেতে উঠল না। যেন গায়ে ধুলো-বালিটিও পড়েনি। বলল, কি, কি-রকম লাগছে?

জবাব দিলাম, মন স্থির করার জন্য মিস জেনট্রিকে একটু সময় দেওয়া উচিত…হঠাৎ একেবারে শকের মতো লাগছে।

গেলাসে মদ ঢালল। দুই এক চুমুক খেল। তারপর মুখ বিকৃত করে বলল, সময় দিলে কি হবে, তোমার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাবে?

সে সম্ভাবনা কম। কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না। আবার দু'চার চুমুক টেনে মারভিন বলল, তখন কি-সব যাচ্ছেতাই গালাগাল

করছিল শুনলাম…। একটু চুপ করে থেকে সকোপে তাকালো আমার দিকে, ঝাঁঝিয়ে উঠল—হাত দুটো কি বিয়ের নামে পঙ্গু হয়ে গেছে? ঠাস ঠাস করে দু'গালে চড় বসিয়ে দিতে পারনি?

সভয়ে ঘুরে তাকালাম। তারপর আরো বিপন্ন অবস্থা আমার। ওদিকে দরজার আড়ালে সারা দাঁড়িয়ে। বাপের কথা কানে গেছে। দুচোখে ভস্ম করছে।

এর পরের ক'টা দিন বিকারগ্রস্ত অবস্থা সারার। রাগারাগি কান্নাকাটি গালাগালি। বাপের মুখোমুখি তর্ক করে, দশবার করে পাগল বলে। আবার অনুনয় অনুরোধও করে। আমাকে দেখলেই দু'চোখে যেন গলগল করে রাগ আর ঘৃণা উপছে ওঠে। যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল করে। দলের আর দশজনকে বলে, বাবার চিকিৎসা কর আর ওই শয়তানটাকে তাড়াও এখান থেকে—ও-ই বাবাকে তুক করেছে, পাগল করেছে।

ব্যাপার এমন দাঁড়াল যে দলের লোকের সুদ্ধু হতচকিত অবস্থা। তারাও পাঁচ-রকম ভাবতে শুরু করেছে। আমার ভিতরেও একটা আত্মাভিমান মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। মেনল্যাণ্ডে আসার পর থেকে মারভিনেরই সুইটের একটা ঘরে আছি। বলতে গেলে তখন থেকেই তার সর্বক্ষণের দোসর আমি। কিন্তু আজ এতদিনে সারার মনে হল, আমি মতলববাজ বলেই অন্য সকলকে ছেড়ে এখানে পড়ে আছি—বাবার মাথাটি খাবার জন্যে, আর এই চক্রান্ত করার জন্য।

দলের বাকি সকলে এ বাড়িরই নীচের তলায় থাকে। আমার ওপর সারার হুকুম হল, কাল থেকে সে যেন দোতলায় আমার মুখ না দেখে। দলের আর সকলে যেমন আছে সেইরকম থাকতে হবে। আমি জবাব দিই নি। শুধু লক্ষ্য করেছি ওকে। তারপর এত ঘৃণা এত বিদ্বেষের কারণ খুঁজেছি।—প্রথম কারণ আমার গায়ের চামড়া। কালো চামড়া। কিন্তু যতদূর ধারণা, সেটাই প্রধান কারণ নয়। আমি কালো, মুখের একদিকে আমার বাঘের থাবার ক্ষতচিহ্ন—তবু না। আমার মুখশ্রী কুৎসিত কেউ বলে না, নির্বোধ কেউ বলে না। বোমার

বরং অনেক সময় বলত, ওই রঙেই তোকে বরং ভালো মানায়, বুঝলি, তুই হলি কালামাণিক। সারার প্রধান বাধা, আমি দাস, ওর বাবার প্রায়-কেনা ক্রীতদাস আমি। জ্ঞান-বয়েস থেকে ও তাই জেনেছে, সেই অনুভূতি নিয়েই আমাকে দেখে এসেছে। কখনো হয়তো স্নেহ করেছে, করুণা করেছে, দীর্ঘ সান্নিধ্যের দরুন অনেক সময় বা অন্তরঙ্গ ব্যবহারও করেছে—'কন্তু রক্ত-মাংসের একটা পৃথক সত্তার তাজা মানুষ হিসেবে দেখেনি কখনো। তাই এত ক্ষিপ্ত। তাই এমন মানসিক বিপর্যয়।

সেই রাতে আমি কর্তাকে জানালাম, তার এই ভালবাসার জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমারও আত্মসম্মান বলে কিছু আছে, তার এ-সঙ্কল্প ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। আর সেই সঙ্গে প্রকারান্তরে বিদায় প্রার্থনা করলাম।

খুব নির্লিপ্ত মুখে মারভিন বলল, মেয়েটা বড় বেশি ঝামেলা করছে আর বড় বেশি উত্যক্ত করছে—না?

আমি নিরুত্তর।

—আচ্ছা কাল থেকে আর কিছু করবে না।

যেন ফয়সালা হয়েই গেল। না বুঝে আমি মুখের দিকে চেয়ে আছি।

মারভিন পুনরুক্তি করল, বললাম তো, কাল থেকে আর উত্যক্তও করবে না—বিয়েতে আপত্তিও করবে না। নিশ্চিন্ত?

কোন মন্ত্রবলে এটা সম্ভব, বা কোন আশ্বাসে সে নিজে এত নিশ্চিন্ত ঠাওর করে ওঠা গেল না। মারভিন আমার মনের খটকা বুঝে নিয়েই যেন মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। এই লোকের মুখে এমন স্নেহ-ঝরা হাসিও কি কেউ খুব বেশি দেখেছে। বলল, হ্যাঁ রে, আমার ওই মেয়েটাকে যে তুই ভালবেসে ফেলেছিস এ তো ঠিক?

কি জবাব দেব? ভদ্রলোক ইদানীং আমার সঙ্গে বেশ ইয়ার্কি-মশকরাও করে এক-একসময়।

তেমনি হালকা হাসি-মাখা ঠেসের সুরেই বলে গেল, ওই জেরোম

ছোঁড়াটার ওপর ছোরা উঁচিয়েছিলি কেন? ও অত্যাচার করতে পারে ধরে নিয়ে আমার মেয়ের পিছু নিয়েছিলি? আর, তার জন্যে চাবকে যখন পিঠ লাল করে দিলাম তার পরেও এই ছোঁড়ার নগদ পাঁচ হাজার টাকার টোপ গিললি না কেন—চাবুক খেয়ে আমাকে ভালবেসে ফেলেছিলি বলে?

আমার গায়ের রং কালো বলেই রক্ষা, নইলে অবস্থা দেখে আরো বেশি হাসির খোরাক পেত। পরক্ষণে মুখখানা ছদ্ম-গাম্ভীর্যে ভরাট। উপসংহার টানার মতো করে বলল, অতএব বাছা, ভালো যখন বেসেছ মরদের মতো ভালবাসতে চেষ্টা করো, মেয়েদের মতো মিনমিন করে ভালবাসতে গেছ কি মরেছ। নিজের চোখে সিংহের খাঁচায় ঢুকতে না দেখলে তোমার এই কথার জন্যই চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যেতে বলতাম।

রাতে ভালো ঘুম হল না। কাল থেকে আ[illegible] মেয়ে গণ্ডগোল করবে না বা বিয়েতে আপত্তি করবে না ঘোষণা করল কি করে—তাই নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েও কূল-কিনারা পেলাম না।

উল্টে পরদিন সকালেই এক দমকা ঝাপটা। বেলা ন'টা নাগাত নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সারা আমাকে দেখেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল —ইউ স্কাউণ্ড্রেল! কাল তোমাকে কি বলেছিলাম আমি? রাতে কোথায় ছিলে?

চোখে চোখ রেখে জবাব দিলাম, ওপরে। আমার ঘরেই।

অস্বাভাবিক রাগে দু'চোখ ঠিকরে পড়তে চাইল।—এত সাহস, এত স্পর্ধা তোমার, অ্যাঁ? শয়তান কোথাকার, আশকারা পেয়ে একেবারে মাথায় উঠেছ? বাবার ওই চাবুকই তোমার মতো শয়তানের উপযুক্ত জিনিস, বাবা ছাড়লেও সেটা হাতে নেবার আর কেউ নেই ভেবেছ— কেমন?

আমি ভাবী বর। আর ওই আমার ভাবী বধূ। সম্ভাষণ শুনে আমার কান জুড়িয়ে গেল। কি যে করব ভেবে পেলাম না। সির সির করে মাথা বেয়ে উঠছে কি। কেউ যেন আমাকে মধুরতর সম্ভাষণের

জাবাবের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। ওর বাপের কথায় গালের ওপর মরদের মতো ভালবাসার নজির রাখার ব্যাপারটাও হাতে নিশপিশ করে উঠল একবার।

ও দিকের ঘরে মারভিন জেনট্রি। মেয়ের কথা শুনতে পাচ্ছে নিশ্চয়। ভদ্রলোক গত রাতেই আমাকে নিশ্চিন্ত করে গেল, বলেছিল, মেয়ে তার কাল থেকে আর উচ্চবাচ্য করবে না, বিয়েতেও আপত্তি করবে না। সকালেই এই।

ওই ঘরের দিকে তাকালাম একবার। সারা আবারও কি বলে উঠতে যাচ্ছিল। তার মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। আমিও হকচকিয়ে গেলাম একটু। ঘর থেকে মারভিন জেনট্রি বেরিয়ে আসছে— হাতে বন্দুক। ঠাণ্ডা মূর্তি। রাগ বিরাগের চিহ্নও নেই মুখে। মেয়েকে বলল, নীচে আয়।

উদ্দেশ্যটা সঠিক না বুঝে মেয়ে চেয়ে রইল। আমিও। মুহূর্তের মধ্যে কারো মুখের ভোল এমন বদলে যেতে পারে তাও জানতুম না। আচমকা মেয়েকে সিঁড়ির দিকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে মারভিন গর্জে উঠল, গেট ডাউন স্টেয়ারস!

মেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল। ঘুরে বাপের দিকে তাকাবার অবকাশও পেল না। মারভিন ঠেলতে ঠেলতে তাকে নীচে নিয়ে এলো। সিঁড়ি দিয়ে পড়ার ভয়ে সারা নিজেই সত্রাসে তরতর করে নেমে এলো। মারভিনের পিছনে বিমূঢ় মুখে আমিও।

নীচের উঠোনে টেনে নিয়ে এলো তাকে, তারপরই আবার বিষম এক ধাক্কা। সেই ধাক্কার চোট সারা সামলে নিতে-নিতেও পড়েই গেল। হাত-পা হয়তো ছড়েও গেল একটু। কিন্তু বাপের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এক হাতে বন্দুক, অন্য হাতের হ্যাঁচকা টানে তাকে তুলে সামনের দেয়ালের দিকে ঠেলে দিল আবার। দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেয়ে বিস্ফারিত ত্রাসে তার বাপের দিকে তাকালো।

ততক্ষণে যে-যেদিকে ছিল ছুটে এসেছে। তারপরেও কাঠ সকলে। আমিও। মারভিন ঠিক দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে বন্দুকের নল সোজা

মেরে বুকের ওপর তুলল। বজ্রগম্ভীর গলায় বলল, আমি এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুনব, তার মধ্যে শুনতে চাই মুখ বুজে ওকে বিয়ে করবে কিনা—পাঁচ গোনা হয়ে গেলে আর বলার সময় পাবে না—

…ওয়ান !…টু্য !…থ্রী…

—ড্যাডি !

সারার আর্ত চিৎকারে আমরা সুদ্ধু যেন একটা সম্মোহনের গ্রাস থেকে ছিটকে বেরুলাম। আমি ছুটে গিয়ে দু'হাতে সারাকে আগলে দাঁড়ালাম। চিৎকার করে সম্ভবত বলতে যাচ্ছিলাম, এ বিয়ে, এমন বিয়ে আমি করতে চাই না, তার জন্যে চাও তো আমাকে মার। কিন্তু সে-অবকাশ মিলল না। তার আগেই সারা দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরল, তারপর ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল।

—ছ্যাট্‌স্ গুড। বন্দুক কাঁধে তুলে নিল বাপ।

আমাকে আঁকড়ে ধরে সারা মুখ গুঁজে কাঁপছে তখনো। ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের দিকে তাকালাম। বন্দুক হাতে মারভিন চলে যাচ্ছে। আমি ঘুরে তাকাতে একবার চোখ টিপে দিয়ে গটগট করে ভিতরে ঢুকে গেল। এই পলকের রসিকতাটুকু আর কারো চোখে পড়ল না।

অন্য সকলে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে তখনো। সারার সংবিৎ ফিরতে আমাকে ঠেলে সরিয়ে পলকের জন্য পরিস্থিতিটা দেখে নিল একবার। রাগে অপমানে আর সেই সঙ্গে কান্নার আবেগ সামলানোর চেষ্টায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

সকলে নির্বাক। আমিও। অদূরে বোমারের চোখে চোখ পড়ল। একটা চোখ বুজে ঘটা করে আর একটা চোখ পিট পিট করতে লাগল সে।

॥ সাত ॥

বিয়ে হয়ে গেল।

এত নির্বিঘ্নে হয়ে গেল যে সেটাই অস্বস্তিকর। সারা যেন কলের মেয়ে। নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই, সত্তা নেই।

উচ্ছল এক প্রাণবন্ত মেয়ের এই গোছের পরিবর্তনে ভিতরে ভিতরে বিচলিত আমি। একটা স্বাভাবিক অনুভূতির পীড়ন অস্বীকার করব কি করে? জন্মকাল থেকে বঞ্চিত রিক্ত আমি, তবু এত বড় প্রাপ্তির জোয়ারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্যের মতো ভেসে যেতে সঙ্কোচ। যা প্রাপ্য নয় তাই পেয়েছি, যা কল্পনা করতে পারি না তাও দখলের মধ্যে এসেছে—এই বিবেকবোধটাই সদর্পে অথবা জোর করে কিছু গ্রহণের ব্যাপারে অন্তরায় হয়েছে। তার বদলে সহজ ভদ্র পথ অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছি আমি। সারাকে সানুনয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, বাইরেটা আমার কালো হলেও ভিতরটা সাদা কিনা পরখ করে দেখতে। বলেছি, যা হয়ে গেল আমার তাতে সত্যিই কোনো হাত ছিল না, কিন্তু হয়ে যখন গেলই, আমি তার যোগ্য হবই গায়ের রং পাল্টাতে পারব না, কিন্তু আর কোনো দিক থেকে তার খেদ থাকবে না। বোকার মতো এমনও বলেছি, মানুষ তার পোষা জন্তু-জানোয়ারকেও ভালবাসে, সেই রকম করেই না-হয় ও চেষ্টা করে দেখুক আমাকে একটু আধটু পছন্দ করা যায় কিনা।

জবাবে সারা একটি কথাও বলেনি। চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে। সে চাউনির মধ্যে যে অবিশ্বাস আর নীরব ঘৃণা আমি দেখেছি, সে যেন আমার অন্তস্তলে গিয়ে খচ খচ করে বিঁধেছে। কিন্তু ওপরওলার প্রতি তখন আমার দ্বিগুণ আস্থা বলেই আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে চেয়েছি, ওর এত বড় বীতরাগেরও অবসান হবে—হবেই। তাই জোর করার বদলে আমি সবুর করার ভদ্র আর দার্শনিক

রাস্তাটাই বেছে নিয়েছি।

এদিকে আমার শ্বশুরও এমন শ্বশুর যে সামনে পড়লে কোন দিকে পালাব ভেবে পাইনে। বিয়ের তিন দিনের মধ্যেই খোস-মেজাজে আস্ত মদের বোতল নিয়ে বসেছে। সেই সন্ধ্যাতেই ডাক্তার তাকে লিভারের অল্প অল্প ব্যথা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন করে দিয়ে গেছে। মদ ছুঁতে বারণ করেছে। গত দু'দিন উৎসবের আনন্দে দেদার মদ গিলেছে। আজ আমি বাধা দেবই সঙ্কল্প করেছিলাম, তার আগেই দেখি মিটি মিটি হাসছে আর আমার দিকে তাকাচ্ছে। —কি হে, কেমন লাগছে?

মদের বোতলটা তার কাছ থেকে টেনে নেবার মতলবে আমি গম্ভীর মুখে কাছে এগিয়ে আসতেই ফস্ করে জিজ্ঞাসা করে বসল, গট হার?

উদ্দেশ্য ভুলে আমি থতমত খেয়ে তাকালাম তার দিকে।

—ইউ ফুল! হাউ ডিড ইউ লাইক হার, ইজণ্ট্ সি ওয়াণ্ডারফুল?

আমার কান গরম। সেই ফাঁকে মদের গেলাস ভরাট করে সে আয়েস করে চুমুক লাগাল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, নাউ ইটস্ ইওর টার্ন টু মেক ইওরসেলফ্ ওরাণ্ডারফুল। মেক হার ম্যাড্ ফর ইউ!

পালিয়ে এসেছি। সামনে রাত্রি। আমার ধৈর্যের পরীক্ষা। লোলুপ গ্রাসের বদলে আত্মাভিমানী প্রবৃত্তির সঙ্গে নিজের যোঝা-যুঝির অধ্যায়। আমার মন বলে, সেটাই পুরুষকার।

রাত্রি। হাসিমুখে সারাকে তার বাপের কথাগুলোই বললাম। কিন্তু আগেও যেমন পাথর, আজও তেমনি। সেই নির্বাক চাউনি আর শুদ্ধ ঘৃণা। প্রতীক্ষায় সে-ও আছে, ভদ্রতার মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কবে কখন আমার স্বরূপ উদ্ঘাটন হবে, কখন আমি পশুর মতো ওর ওপর পড়ব, আর প্রবৃত্তির যূপ-কাঠে ও বলি হবে—সেই অসহ্য ঘৃণ্য মুহূর্তের প্রতীক্ষা।

…পড়লে কি হবে আমি তাও জানি। এমনি নির্বাক, নিস্পন্দ

কাঠ হয়ে থাকবে, আর দু'চোখের অব্যক্ত ঘৃণায় আমাকে ডুবিয়ে নির্মূল করে দিতে চাইবে।

না, আমি কাছে যাইনি, কাছে টানতেও চেষ্টা করিনি। রাত্রি বিস্বাদ হয়ে গেছে আমার কাছে।

পরে আবার একদিন শ্বশুর আমাকে প্রগল্‌ভ খোঁচা মেরেছে। বলেছে, এখানে সকলের মধ্যে পড়ে আছ কেন, দিনকতকের জন্য মেয়েটাকে নিয়ে কোথাও সরে পড় না কেন, আহম্মক কোথাকার!

সেই রাতে গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটেছি আমিও। সারাকে তার বাপের প্রস্তাব জানিয়েছি বলেছি, ভাবছি দিনকতকের জন্য কোথাও থেকে ঘুরে আসব।

পুঞ্জীভূত ঘৃণা ছাড়াও অসহায় চকিত ত্রাস দেখেছি ওর চোখে-মুখে। বিপদ একেবারে এগিয়ে এসেছে দেখলে অসহায় পাখিও আঁচড় কাটে। এবারে কথা ফুটেছে। বলে উঠেছে, তোমার মতো মতলববাজকে চিনতে কারো বাকি নেই, নিজের মতলব হাঁসিল করার জন্য বাবাকে যে তুমি হাতের পুতুল বানিয়েছ, বুঝতে কারো বাকি নেই— বাবার দোহাই দিচ্ছ কেন?

ওকে কথা বলাতে পারার দরুনও খুশি হতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারা গেল না। অপমানে ভিতরটা চিনচিন করতে লাগল। তবু হাসিমুখেই বললাম, আমাকে তাহলে একেবারে চিনে ফেলেছ তুমি?

একবার মুখ ফোটার ফলে ও ক্ষেপে উঠল।—তোমাকে? তোমাকে চিনতে বাকি? তুমি নোংরা, নীচ ছোটলোক লোভী তুমি—তোমাকে আমি এ জীবনে ক্ষমা করব? তুমি আমার জীবন মাটি করেছ, তুমি আমার সর্বস্ব গ্রাস করেছ, তুমি আমার বাবাকে শত্রু বানিয়েছ— দাস ছিলে, যড় করে এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ বনেছ ভাবছ। আমি সর্বক্ষণ তোমার মৃত্যু কামনা করছি, যে মৃত্যু তোমার উপযুক্ত শাস্তি সেই রকম ভীষণ মৃত্যু—বুঝলে? তারপরে আমি ঠাণ্ডা হব, তারপরে আমি হাসব—বুঝলে?

আমার ভিতরের নরম তন্ত্রীগুলো সব ও যেন টেনে টেনে ছিঁড়তে

লাগল। দিশেহারা কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম আমি। কাছে এসে দাঁড়ালাম। খুব কাছে। মাথায় রক্ত চড়ছে। চড়ছেই। সত্যিই কি আদিম হিংস্র বন্য আমি? অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে ভরপুর বলেই ভদ্রতা আর ধৈর্যের মুখোশ পরেছিলাম?

জানি না।

ওর গালের ওপর আমার আঙুলের শক্ত পাঁচটা দাগ বসে গেল। টাল সামলাবার চেষ্টায় তিন হাত সরে গেল। দুহাতের হ্যাঁচকা টানে তক্ষুনি সামনে টেনে আনলাম আবার। হিংস্র দুই বাহুর নিষ্পেষণে, দাঁত আর অধরের নিপীড়নে দম বন্ধ করে দিতে চাইলাম—তারপর তেমনি আক্রোশে শয্যায় ঠেলে দিলাম।

ও প্রাণপণে যুঝল। বিকারগ্রস্তের মতো কিল-চড় লাথি ছুঁড়তে লাগল। আমি আঘাত পেলাম। পাল্টা আঘাত দিলাম। ওর সমস্ত শক্তি নিঃশেষে হরণ করে নিতে চাইলাম।

…নিলাম।

ঘরে আলো জ্বলছে। পুরুষের হিংস্র উল্লাসে রমণী যেন এক ভয়াবহ মৃত্যুর গহ্বরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আর, নেই অমোঘ পরিণামের মধ্যে ডুবে যেতে যেতেও সে যেন তার ঘাতককে দেখে নিচ্ছে।

কিন্তু তারপর?

একটা দুটো করে ক'টা দিন গেল। দিনের আলোয় আমি এক মানুষ। শান্ত, বিনীত, অনুতপ্ত। একজনের ভুল ভাঙব, হৃদয় দিয়ে তাকে জয় করব—সে-লক্ষ্য থেকে আমি কত দূরে সরে এসেছি আর সরে আসছি সেটা অনুভব করতে পারি। একটা মানুষের মতো তার কাছে উঠে আসা কবর থেকে উঠে আসার সামিল যেন।

ভদ্র বিনয়ের আড়ালে এই হতাশা সমস্ত দিন ধরে আমাকে কুরে কুরে খায়। এই যাতনাই একটু একটু করে আমাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। দিনের আলোয় টান ধরার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মধ্যে এক হিংস্র পশুর অধিকার বিস্তার শুরু হয়। আমি প্রাণপণে তার সঙ্গে

যতক্ষণ সম্ভব যুঝতে চেষ্টা করি। তারপর হেরে যাই। হেরে না যাওয়া পর্যন্তই যাতনা। তারপর বিপরীত উল্লাস। রাতের প্রতীক্ষা। সর্বস্বান্ত মানুষ যেমন করে আত্মঘাতী নেশার অতলে ডুব দিতে চায়, তেমনি একটা তাড়না আমাকে প্রবৃত্তির অতল গহ্বরের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে।

ও বুঝতে পারে। দুই চোখে ঘৃণা ঠিকরে উঠতে থাকে। আত্ম-রক্ষার তাগিদে ত্রস্ত হরিণীর মতোই আমার থাবা থেকে দূরে সরে যেতে চায়, পালাবার পথ খোঁজে। কিন্তু যাবে কোথায়? পালাবে কোথায়? যেখানে যে-ঘরে গিয়ে বসে থাকুক, ক্রূর ব্যাধের মতো ওকে নিজের কবলে নিয়ে আসা আমার পক্ষে তখন জল-ভাত ব্যাপার। একমাত্র ওর বাবার ঘরে পালালে হয়তো আমি থমকাব। কিন্তু সেখানে যে আশ্রয় মিলবে না, ওর থেকে ভালো আর কে জানে। তার জীবনে বাপের মতো শত্রু আর নেই।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি যে কানা-গলির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি সেটা সত্যি। ক্রমে দিনের আলোতেও একটা অন্ধ আক্রোশ আমাকে পেয়ে বসতে লাগল। শ্বশুর আমাকে কাজ-কর্ম বোঝাবার জন্য ডাকে। তার হাতে-গড়া এই প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী ভাবে আমাকে। তা ছাড়াও ওই নিঃসঙ্গ মানুষ হামেশাই আমার সঙ্গ চায়। কিন্তু আমি কাজে মন দিতে পারি না, তিনবার করে বললে এক কথা কানে ঢোকে না। আমার উদ্যমের অভাব তৎপরতার অভাবও লক্ষ্য করছে ভদ্রলোক। না ডাকলে নিজে থেকে তার কাছে যাওয়াও ছেড়েছি।

বিরক্ত মুখ করেই একদিন জিজ্ঞাসা করে বসল, কোন রাজ্যে বাস করছ আজকাল, কিছু গণ্ডগোল চলেছে নাকি? মেয়েটাকে এখনো টিট্ করতে পারোনি?

সপ্রতিভ মুখ করে তার চোখে ধুলো দিতে চেষ্টা করলাম। তার সন্দেহ কতটা সত্য জানতে পারলে মেয়ের ওপর ক্রুদ্ধ হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকে অপদার্থ ভাববে একটা তাতেও ভুল নেই।

বললাম, না, গণ্ডগোল একটু আপনাকে নিয়ে চলেছে, যে-হারে আপনি ডাক্তারকে কলা দেখাচ্ছেন, আমাদের কি করণীয় ঠিক বুঝে উঠছি না॥

ভদ্রলোক হা-হা করে হেসে উঠল। অনেক দিন হল তার মদের মাত্রা কমানোর ব্যাপারে কোনরকম সক্রিয় চেষ্টা নেই আমার দিক থেকে। অতএব সে-মাত্রা যে বাড়ছে সহজেই অনুমান করতে পারি।

কিন্তু নিজের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়। তাই হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ঠিক করলাম দিন-কতকের জন্য বাইরেই যাব। সারা? সে-ও সঙ্গে যাবে বই কি! স্বেচ্ছায় যাবে না। তাকে যেতে হবে। এটা প্রতিশোধের নেশা কি নতুন কোন পথ খোঁজার চেষ্টা, জানি না। শ্বশুরের কাছে অভিলাষ ব্যক্ত করতে সে সানন্দে রাজী।

সারা শুনল। আপত্তি করল না। আপত্তি করলে লাভ হবে না জানে। স্থির চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল আমাকে। সেই চাউনির তলায় শুধু ঘৃণা, ঘৃণার সমুদ্র।

বোমার বিদায় দিতে এসেছিল। এরোপ্লেনে ওঠার আগে সারাকে দেখিয়ে আমাকে একটা কনুইয়ের খোঁচা মেরে বলেছিল, কি ব্যাপার? তুমি যে দেখি একটা শবদেহ নিয়ে আনন্দ করতে চলেছ!

...তারপর সারার দিকে চেয়ে মনে মনে আমিও অনেক বার ভেবেছি, কোনো জাদুমন্ত্র-বলে শবদেহে প্রাণ আনা যায় না? যায় না?

পাহাড়-ঘেঁষা সুন্দর একটা খটখটে ছোট জায়গায় এসেছি আমরা। আকাশ-পথে দু-তিন ঘণ্টার যাত্রা। এ-জায়গাও আমি নির্বাচন করিনি, সারার বাবা বেছে দিয়েছে। প্রাচ্যভূমির সর্বত্রই ঘুরেছে সে।

পর্যটকদের একটাই নামী হোটেল সেখানে। বেড়াবার মরসুম নয় বলে যাত্রীর ভিড় তেমন নেই। আবার একেবারে যে নেই এমনও নয়। পয়সার জোর বুঝে হোটেলের ম্যানেজার সব থেকে দামী এবং

আরামের সুইটএ এনে তুলল আমাদের। কিন্তু সারার নির্বাক যান্ত্রিক আচরণের দরুনই তার চোখে পলকের সংশয় দেখলাম কিনা জানি না। কালো মানুষের এই সুরূপা সঙ্গিনীটি যথার্থই স্ত্রী অথবা অপর কোনো ঝামেলার ব্যাপার কিছু, সেই সংশয়ও হতে পারে।

রওনা হবার পর থেকেই সারা যা ভাবছে, আমি তার বিপরীত ব্যবহার করব বলে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। ও ধরেই নিয়েছিল ওকে আরো বেশি করে নিজের কবলে পাবার, আর, ওর সর্বক্ষণের স্বাধীনতা হরণের ক্রূর অভিলাষ নিয়েই বেরিয়েছি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি নিজেকে উদার করে তুলেছিলাম, স্থির করেছিলাম এই ক'টা দিনের বিপরীত আচরণের ফল কি হয় দেখব। আমার কাছে রেখে, নাগালের মধ্যে রেখেও ওকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেব। অবাধ স্বাধীনতা দেব। আমার বাসনা এই ক'টা দিন অন্তত ওকে স্পর্শও করবো না।

কিন্তু মানুষ এমান স্নায়ুর দাস যে শুরুতেই সব ওলট-পালট। সারার সেই নির্বাক স্থির কঠিন ব্যবহারে শুধু ম্যানেজার নয়, অন্যান্য বাসিন্দাদের কেউ কেউও ঈষৎ সন্দিগ্ধ। এমন কি বিকেলে বেড়াবার সময় কেউ কেউ সংগোপনে লক্ষ্যও করেছে আমাদের। দূর থেকে ফিবে ফিরে তাকিয়েছে। ফুলের মতো দেখতে অথচ এমন পাথরের মতো নিষ্প্রাণ মূর্তি কেন মেয়েটার! সে যে এক অবাঞ্ছিত-কবলিত সেটা তার প্রতি পদক্ষেপে সুস্পষ্ট।

আমাব উদার হবার সমস্ত সঙ্কল্প ধূলিসাৎ। যা ও সকলকে জানাতে চেয়েছে বোঝাতে চেয়েছে—রাতের অন্ধকারে তাই নগ্ন সত্য হয়ে উঠেছে। জানোয়ার ভিন্ন আর কিছু যখন ভাববেই না, জানোয়ার হতে আর দ্বিধা নেই। বরং দ্বিগুণ উল্লাস। সেই উল্লাসে শুধু রাত নয়, ওর দিনও বিষিয়েছি আমি।

তিনটে দিন গেল। এ পর্যন্ত সারা মুখ বুজেই আছে। কিন্তু ওর চোখে শুধু অব্যক্ত ঘৃণা নয়, ধিকি-ধিকি আগুনও জ্বলে উঠতে দেখেছি আমি।

চার দিনের দিন জীবনের আবার এক নতুন অধ্যায়ে আচমকা

পদক্ষেপ আমার।

তখনো বেলা পড়েনি। ঘরের সামনে বারান্দায় চেয়ার পেতে বসেছিলাম। সামনে চারদিকে দেয়ালের মতো পাহাড। একেবারে লাগোয়া মনে হয়। পাহাড়ের ওধারে কোথাও জঙ্গল, কোথাও বা জল-ভূমি। পাহাড়ের গায়ে বাঁধানো পথ আছে—আবার পথ ছেড়ে পাথর টপকেও ওপরে ওঠা যায়।

আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। চুপচাপ দেখছিলাম। না, প্রকৃতির শোভা দেখছিলাম না। ভিতরে অসুন্দরের ছায়া পড়লে বাইরের সৌন্দর্যও মুছে যায়। আমার চোখেও কোনো সুন্দরের অস্তিত্ব নেই। ক্লান্ত লাগছিল। একটা শূন্য অসম্পূর্ণতা চারদিক থেকে ছেঁকে ধরছিল আমাকে।···মাত্র ঘণ্টা দেড়েক আগেও অশান্ত আক্রোশে নিজের টুঁটি ধরে নিজেকে আমি জানোয়ারের পর্যায়ে টেনে নামিয়েছি। তেমনি মত্ত আনন্দে সারার চোখে সেই ঘৃণার সমুদ্র দেখেছি, আর তার তলায় সেই ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলতে দেখেছি।

অনেকক্ষণ সারার সাড়াশব্দ পাইনি। অবশ্য সাড়াশব্দ এমনিতেও নেই। শুধু একটা অস্তিত্ব আছে। ঘাড় ফিরিয়ে দু-চার বার ঘরের দিকে তাকিয়েছি। শূন্য ঘর আর শূন্য শয্যা দেখে ভেবেছি ওদিকের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বা বসে ক্ষোভ জুড়োতে চেষ্টা করছে।

হঠাৎ সচকিত আমি। মনে হল সামনের পাহাড়ের গা বেয়ে এক পরিচিত মেয়ে উপরে উঠছে। খুব ছোট দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু আমার স্ত্রী ছাড়া আর কে হতে পারে? উঠে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। সারাই বটে। ওর এই অশান্ত পদক্ষেপও আমি চিনি। বেড়াবার মতো করে পা ফেলছে না, এই চঞ্চল গতি কেমন অস্বাভাবিক মনে হল আমার।

পথ ছেড়ে এবারে পাথর বেয়ে উঠছে। ধকলের ব্যাপার সেটা, আর মেয়েদের পক্ষে নিরাপদও নয় খুব। আমি বিরক্ত, ক্রুদ্ধও একটু। কিন্তু আমাকে দেখছে কে?

···দেখল।

পরক্ষণে মনে হল আমাকে দেখবে বলেই ও-ভাবে ওইখানে উঠেছে। উঠে সোজা এই হোটেলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সোজা আমার দিকে।

তারপরেই বিমূঢ় আমি। সারা ডাকছে আমাকে, একটা হাত মাথার ওপরে তুলে আর সজোরে নামিয়ে বার কয়েক ডাকল আমাকে। ওর চোখ-মুখ আমার নজরে আসছে না, তবু মনে হল ওই চোখ জ্বলছে, ওই মুখ জ্বলছে—ওর সর্বাঙ্গ জ্বলছে। এ সেই ষষ্ঠ চেতনার পূর্বাভাস কিনা জানি না, কয়েকটা মুহূর্তের জন্য নিস্পন্দ পঙ্গু যেন আমি। আমার মন বলল, কিছু একটা ঘটবে, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

সারা আবার হাত তুলল। আবার ডাকল আমাকে।

আমি ছুটলাম।

কিছু একটা প্রতিবোধের তাগিদে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি…জানি না কি।

বাঁধানো পথ ধরে ছুটেই ওপরে উঠতে লাগলাম। আমি শক্ত সমর্থ পুরুষ, জঙ্গলে আর পাহাড়ে ছোটাছুটি করে অভ্যস্ত। কিন্তু আজকের এই পাহাড়ী পথ অসহ্য রকমের দীর্ঘ লাগছে।

যেখান থেকে পথ ছেড়ে দিয়ে ও পাথর বেয়ে ওপরে উঠেছে সেখানে এসে থমকে দাঁড়ালাম। সভয়ে দেখলাম সারা পাথর টপকে আরো অনেক ওপরে উঠে গেছে।

—সারা!

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি। ও ঘুরে দাঁড়াল বিজয়িনীর ভঙ্গিতে দুই বাহু বুকের ওপর তুলে দেখল আমাকে। ওর চোখে এত আগুন, মুখের এমন অগ্নিবর্ণ আমি আর দেখিনি। ও কিছু করবে—করবেই, সেটা বুঝতে আমার এক মুহূর্ত সময় লাগল না।

আবার ঘুরল। আরো উঠতে লাগল।

পাগলের মতোই আমি পাথর বেয়ে উঠতে চেষ্টা করছি। কিন্তু ও তখন অনেক উঁচুতে নাগালের অনেক উর্ধ্বে।

—সা-রা!

আবার ফিরল। তেমনি করে বুকের ওপর দু'হাত তুলে দেখল। আমার মনে হল হাসছে একটু একটু। সেই হাসিতে আগুন ঠিকরোচ্ছে। ঘুরে ধীরে-সুস্থে তারপর আরো দুটো পাথর টপকালো।

—সা-রা-আ!

—শাট্ আপ্ ইউ ব্রুট্! ইউ ইনফার্নাল ডগ। এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে গলা দিয়ে তীক্ষ্ণ তীব্র আগুন ছড়াল এইবার—কাম অন অ্যাণ্ড্ ক্যাচ মি ইউ ব্লাডি সোয়াইন!

আমি উঠছি। বুকের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ছে। ও স্থির দাঁড়িয়ে আছে। অফুরন্ত ঘৃণায় দুই চোখ ধক-ধক করে জ্বলছে। আমার ওঠার দৌড় দেখছে। একটা বিকৃত আত্মধ্বংসী আনন্দে ভরপুর যেন।

—স্টপ নাউ, ইউ ব্রুট্।

আমি তখনো ওর থেকে একতলা সমান নীচুতে। তবু পরের পাথরটায় আর একটা পা তুলতে ওর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ যেন জ্বলন্ত চাবুকের ঘায়ে থামিয়ে দিল আমাকে। —আই সে, স্টপ্, ইউ ডার্টি ডগ, ইউ ড্যাম ফুল! আর এক ধাপ উঠেছ কি, মজার দৃশ্যটা দু'চোখ ভরে এক্ষুনি দেখতে পাবে।

আমি পঙ্গু। নিস্পন্দ। অসহায়।

পাথরের ওপর দু'বার পায়ের আঘাত করে ও তেমনি উন্মত্ত আক্রোশে বলে উঠল, এখন তুমি কি দেখতে যাচ্ছ? আর দু'মিনিটের মধ্যে তুমি কি দেখবে বুঝতে পারছ? এই সুন্দর শরীরটা, তোমার এত লোভের শরীরটা ভেঙে গুঁড়িয়ে তাল-গোল পাকিয়ে গেলে দেখতে কেমন হবে বুঝতে পারছ না? পারবে, এক্ষুনি পারবে।... আমি তোমার স্ত্রী সারা কার্টার, না? ক্রীতদাস কুকুর কোথাকারের—তোমার স্ত্রী? তোমার স্ত্রী হবার ফল কি বাবাকে দেখিয়ে দিও, তাল-গোল পাকানো মাংসপিণ্ডটা তাকে নিয়ে দেখিও—বোলো—তার বন্দুক দেখে ভয় পেয়ে যে ভুল করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত হল। এইবার সে যেন আনন্দে নাচে। আমি দেখব আর তাকে অভিশাপ দেব আর

তোমাকে অভিশাপ দেব। বুঝলে? বুঝলে?

—সারা! সারা! আমি আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম।—সারা, এই একটি বারের মতো আমাকে ক্ষমা করো, আমি প্রতিজ্ঞা করছি—

—শাট আপ্। তোমাকে ক্ষমা করব? তোমার প্রতিজ্ঞা বিশ্বাস করব? তোমাকে? তোমাকে?

আমি পাগলের মতো বলে গেলাম, সারা। একদিন আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতাম, সেই ঈশ্বরের নাম নিযে আজ আমি শপথ করছি, আর আমি তোমার ওপর দাবি রাখব না। ঈশ্বরের নাম করে শপথ করছি, তোমার অনুমতি ভিন্ন এ-জীবনে আর আমি তোমাকে স্পর্শ করব না। সারা, বিশ্বাস করো, জীবনে এই একটা বার তুমি আমাকে বিশ্বাস করে দেখো। আমি বিশ্বাসঘাতক হলে এ পথ তোমার চিরকাল খোলা থাকবে—বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো।

ক্রুর চোখের গভীর দৃষ্টি। ঘৃণার সঙ্গে অবিশ্বাস মিশে আছে তখনো। তবু যেন থমকেছে একটু। দেখছে। ওপর থেকে আমার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।

দেখছে। দেখছেই।

দর-দর করে ঘামছি আমি। ক'টা মুহূর্তের মধ্যে একটা কল্পান্ত যেন।

—উঠে এসো।

মর্মান্তিক উত্তেজনায় পাঁচ ছ'টা পাথর উঠে গেলাম।

—থামো!

থমকে দাঁড়ালাম। হাঁপাচ্ছি। তাকালাম। ওর চোখে-মুখে সেই অবিশ্বাস আর সেই ঘৃণা।

—কি বললে?

ঈশ্বরের নাম নিয়ে আমি শপথ করছি তুমি না চাইলে কোনোদিন তোমাকে স্পর্শ করব না।

তেমনি গভীর বিতৃষ্ণা নিয়েই দেখছে। দেখছে দেখছে দেখছে।

—আবার বলো।

ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ করছি তুমি না চাইলে এ-জীবনে তোমাকে স্পর্শ করব না।

দেখছে। এ-দেখার কি শেষ নেই!

—ফের বাবার আশকারা পেলে?

—ঈশ্বরের দিব্য, না না না!

উত্তেজনার অবসান। টান-টান স্নায়ুগুলো শিথিল। সাবারও তাই সম্ভবত। আরো খানিক বাদে আমার ওপর থেকে চোখ সরাল। এতক্ষণে যেন দেখল কোন সংকটের চূড়ায় উঠে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল একবার। তারপর আস্তে আস্তে ওই পাথরটার ওপরেই বসে পড়ল।

নিজের দুটো পা টেনে টেনে উঠলাম। সারা অবসাদে দু'চোখ বুজে ছিল। তাকালো।

চেয়ে আছে।

আমিও।

এখনো বিশ্বাস করবে কি করবে না ওর চোখে সেই সংশয়।

অনেকক্ষণ বাদে উঠল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ধরব?

মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে ও জবাব দিল, হ্যাঁ। সেই অনেক অনেক আগে দরকার হলে যে-ভাবে সাহায্য করতে, সেই রকম করে। তাতে আমার আপত্তি হবে না।

অর্থাৎ ও যখন সারা কার্টার হয়নি তখনকার মতো করে, ও যখন মনিব-কন্যা আমি ক্রীতদাস—তখনকার মতো করে।

৷ আট ৷

সারার নয়, মুক্তি যেন আমারই।

আমার অস্তিত্বের একটা বড় অংশ ওর মধ্যে বিকিয়ে গেছল। প্রভুত্বের নামে ক'টা মাস সে দাসত্বই করেছে। সেটা মুক্ত।

কিন্তু অবিমিশ্র মুক্তি কতদিন ভালো লাগে? আকাশের উদার মুক্তির মধ্যে যে-পাখি ডানা মেলে ভেসে বেড়ায়, সেই ভেসে বেড়ানোটা যদি অনন্ত কালের হত? মুক্তির ছেদ না থাকলে মুক্তির স্বাদ মেলে না।

আমার ছেদ নেই।

একে একে সাত বছর কেটে গেছে। আমি প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। অনেক প্রলোভনের মুহূর্তে, প্রতিষ্ঠানের একরোখা পরিচালক হিসেবে আমার এক-একসময়ের দাপট কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কিনা সেই সংশয়ে সারা অনেক সময় নিজের বিচার-বিবেচনার ভারসাম্য হারাতে বসেছে। শ্যেন-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছে আমাকে, তার দু'চোখে সেই ঘৃণা আর অবিশ্বাস চিকিয়ে উঠেছে।

এখন ও নিশ্চিন্ত। এমন কি পরিস্থিতি বিশেষে সময় সময় একটু আধটু উদারও। আমাদের এই জীবনে সে-রকম পরিস্থিতি হামেশাই আসে। এই তো বছর দেড়েক আগে এক গ্রাম্য জায়গায় দড়ি ছিঁড়ে আর বাঁশ উপড়ে আমার ক্যাম্প ধরাশায়ী (এর পিছনে বোমারের ইচ্ছাকৃত কিছু হাতযশ ছিল বলে মনে মনে সন্দেহ আমার।) সারা সহজ মুখেই আমাকে নিজের ক্যাম্পে ডেকে নিয়েছিল। সাদাসিধে রসিকতাও করেছিল একটু, বলেছিল. দুটো বিছানার মধ্যে যেন কম করে চার হাত ফারাক থাকে।

দীর্ঘকালের সহ-অবস্থানে অনেক কিছু সয়। আমাদের ইউনিটের এক মেয়ে পুঁচকে বাঁদর পুষেছিল একটা। বছর পাঁচেক বাদে সে ওটাকে বুকে চেপে রেখেই দিব্যি ঘুমোত। বিশ্বাস ছেড়ে, চাইলে স্ত্রীর কাছ থেকে সেই গোছের একটু-আধটু প্রশ্রয়ও হয়তো বা মিলতে পারত। তাছাড়া, ওকে আমি যতটুকু চিনেছি, অভাববোধ একটা তারও থাকা স্বাভাবিক।...আর, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর নজিরও বিরল নয়।

না। ভিক্ষুকের মূর্তিতেও কোনোদিন ওর সামনে দাঁড়াইনি।

বলতে গেলে কর্তা বেঁচে থাকতেই প্রতিষ্ঠানের আমি পরিচালক।

বছর দেড়েক হল দেশে থাকতেই মারভিন জেনট্রি গত হয়েছে। তার আগে বছরের মধ্যে অনেকবার ঘুরে ফিরে তাকে হাসপাতালে থাকতে হত। তাকে একসঙ্গে বেশি দিন সুস্থ রাখা কোনো ডাক্তারের কর্ম নয়। নিষেধ অমান্য করার ঝোঁক তার কাছে যেন এক কৌতুককর ব্যাপার। ডক্টর কেলার যখন গম্ভীর মুখে তাকে এটা-সেটা বোঝাত, সে-ও গম্ভীর মুখে তা বুঝে নিয়ে মাথা নাড়ত। সে প্রস্থান করা-মাত্র তার সব নির্দেশ বাতিল।

আমার ধারণা লোকটা জেনে-শুনে আত্মহত্যা করেছে। সে কারো থেকে কিছু কম বুঝত না, কারো থেকে কিছু কম জানত না। কিন্তু জেনে বুঝেও স্বেচ্ছাচারীর মতো চলত। নিজেকে ক্ষয় করত। জীবনের ওপর তার ঠিক কি অভিযোগ ছিল আমি আজও জানি না।

স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বজায় থাকলেও আমার আর সারার বিচ্ছেদ সে টের পেয়েছিল। আমি বলিনি। সারা তো বলবেই না। কিন্তু বিচক্ষণ মানুষটার চোখে কিছুই এড়ায়নি। ক'দিনের হনিমুন থেকে ফেরার পরেই আমার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস কি-ভাবে কাজের মধ্যে আমি নিজেকে সঁপে দিয়েছি স্বচক্ষে দেখেছে। কোনোরকম পিছু টান থাকলে কোনো মানুষ নিজেকে এমন কলের মানুষ করে ফেলতে পারে না।...তারপর দেশে ফিরে তারই এই বাড়িতে আমাদের আলাদা ঘরের শয্যা তো দেখেছেই।

আগেও অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে কি হয়েছে, দেশে ফিরেও জানতে চেয়েছে। আমি বলিনি। বলেছি, এ নিয়ে আপনার মাথা না-ঘামোনোই ভালো।

তার রাগ হয়েছে। কিন্তু তার সেই মেজাজের দিন আর নেই তাও বুঝেছে।

বছর তিনেক আগে মারভিন একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অবস্থা সঙ্কটের দিকে গড়িয়েছিল। হাসপাতালের কেবিনে এক সন্ধ্যায় আমার দু'হাত ধরে বলেছিল, হ্যাঁ রে, কি হয়েছে তোদের আমাকে বলবিই না?

সেই দুর্বল মুহূর্তে বলেছিলাম। এতটুকু গোপন না করে সবই বলেছিলাম। শুনে মারভিন জেনট্রি স্তব্ধ খানিক। তারপর ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, তুই বাধা দিতে গেলি কেন ?

—বাধা না দিলে ও মরতই বলে। ওর চোখে-মুখে সেদিন আমি মৃত্যু দেখেছিলাম।

খানিক চুপ করে থাকার পর আগের সেই মূর্তি। সরোষে বলে উঠেছিল, আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করছি।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। বলেছিলাম, এ নিয়ে আপনি ওকে একটি কথা বললে পরদিন থেকে আর আমাকে এখানে দেখবেন না।

রেগে গেছল। বলেছিল, তুই জাহান্নামে যা! কিন্তু আমি ছাড়া এতবড় শক্তিমান মানুষটাও যে কত অসহায় জানতুম। সেদিন থেকে একটু ভয়ই করত মনে মনে আমাকে। বলেনি! কিন্তু এরপর মেয়ের প্রতি তার ব্যবহার অনেক সময় অকারণে রূঢ়, লক্ষ্য করেছি। আর, প্রতিষ্ঠানের আমিই যে সব, আর কেউ কিছু না—মেয়ের সামনে এ-ঘোষণাও তাকে অনেক সময় বাতাসে ছুঁড়তে দেখেছি।

তার মৃত্যুর পর আমাদের বিচ্ছেদটা পাকাপোক্ত হবে ধরে নিয়েছিলাম। কারণ, ভরা যৌবনে সারার সঙ্গীর অভাববোধটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। আমি চিরদিনের মতোই বাতিল, সে-জায়গা পূরণ করতে অনেকেই সাগ্রহে এগিয়ে আসতে পারে, দুই একজনকে যে সারা পছন্দও করে একটু-আধটু—সে-খবর বোমার আমাকে জানিয়েছে। এই এক বিচিত্র মানুষ আমার জীবনে। সারার ধারণা, এই লোকটা ওর মায়ের এক ব্যর্থপ্রণয়ী। এই ধারণার রসদ কে ওকে জুগিয়েছে বলতে পারব না—বোমার নিজে হওয়াও বিচিত্র নয়। সেই কারণেই ওর ওপর সারার অন্ধ বিশ্বাস আর অগাধ টান। সেই বোমার আমাকে খবর জোগাবে এ ওর কল্পনার অগম্য।

কিন্তু মৃত্যুর পরেও বিচ্ছেদে বাদ সেধে গেল মারভিন জেনট্রি। তার উইলে দেখা গেল প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা আমি টনি কার্টার —সারা কার্টার কেউ নয়। কেবল আমার অবর্তমানে প্রতিষ্ঠানের

অর্ধেক মালিক সারা কার্টার, বাকি অর্ধেকের মালিক হবে প্রতিষ্ঠান যারা সচল রাখবে অথবা বড় করে তুলবে সেই প্রধান কর্মীরা। তাদেরও নামের তালিকা আমি টনি কার্টার ঠিক করে দেব। আমাদের দুজনেরই অবর্তমানে অথবা কোনো বংশধরের অবর্তমানে বাকি অর্ধেক অংশেরও অর্থাৎ সমস্ত প্রতিষ্ঠানেরই মালিকানা ওই কর্মীদের ওপরেই বর্তাবে।

বাপের উইলের মর্ম জানার পর সারার দু'চোখ আবার কিছুকাল নিঃশব্দে জ্বলতে দেখেছি আমি। সেই ঘৃণ্য আর সেই বিদ্বেষ উপছে উঠতে দেখেছি। ই উইল করার পিছনে আমার সক্রিয় কারসাজি কিছু ছিল না এ ওর পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। ঠিক যেমন করে ওকে গ্রাস করেছিলাম তেমনি করেই বাপের সম্পত্তি গ্রাস করেছি বলে ওর ধারণা।

ঝোঁকের মাথায় সেদিনই আমি ওকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। প্রথমে ঠাট্টা করেছিলাম, ক্রীতদাস সব দখল করে বসল এ বড় তাজ্জব ব্যাপার, না?

সারা তপ্ত জবাব দিয়েছিল, এ রকম তাজ্জব ব্যাপার ঘটতে পারে সেটা বাবা যেদিন আমাকে বলি দিয়েছিল সেদিনই বোঝা গেছে।

বলি দিয়েছিল অর্থাৎ আমার সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছিল। আমি হেসেছিলাম। হাসতে পেরেছিলাম। বলেছিলাম, বড় আফসোসের কথা!···তা এই ক্রীতদাস আবার তার মনিব-কন্যাকে ফিরে কিছু দান করতে পারে। নেবে?

চাউনিটা আরো উগ্র আরো তপ্ত হয়ে উঠেছিল সারার। জবাব দেয়নি।

আমি বলে বসেছিলাম, তোমার বাবার উইলের শর্ত অনুযায়ী আমার অবর্তমানে প্রতিষ্ঠানের অর্ধেক মালিক তুমি, বাকি অর্ধেকের মালিক প্রতিষ্ঠানের লোকেরা।···তুমি চাইলে আমি এক্ষুনি অবর্তমান হতে পারি। বল তো ব্যবস্থা করি।

এক ধরনের গোঁ যে আমার আছে এই ক'বছরে সেটা অন্তত

ভালভাবে টের পেয়েছে। বাপের সদ্য-বিয়োগের পর আমি ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান চলতে পারে ভাবেনি। বাপ বেঁচে থাকতেই শেষের ক'টা বছর সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমি বহন করেছি। তাই মুখের ওপর কথাগুলো ছুঁড়ে দিতে একটু বোধহয় ঘাবড়ে ছিল। বলেছিল, থাক, তোমার দাক্ষিণ্য কেউ চায়নি।

আমি জানি, পরে— অনেক পরে কাঁটা দূর করার এমন একটা সুযোগ হেলায় হারানোর জন্য অনুশোচনায় ও নিজের হাত কামড়েছে। অনেক পরে—প্রতিষ্ঠানের যখন জমজমাট অবস্থা। আর, যখন এই প্রতিষ্ঠানের অনন্য তারকা রডনি ওর চোখে একমাত্র পুরুষোত্তম।

রডনি ওয়েনস্টন। আমার তুলনায় সুপুরুষ যে বটে, অস্বীকার করি না।

সারা তখন অনেক সময় কথার ছুঁচে বিঁধে আমার মুখ দিয়ে প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যাবার মতো ওই গোছের গোঁ-ধরা কথা বার করে নিতে চেষ্টা করেছে কিন্তু আমার তখন কানে তুলো, পিঠে কুলো।

আজকের এই তেত্রিশের সারা কার্টারের ফর্সা মুখ রডনির নাম শুনলেই রাগে রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। আর আগুন-খানা মেয়ে গার্টির নাম শুনলেও। তবু গার্টির প্রতি কৃতজ্ঞ। বলে, ও আমার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল, তোমার জন্যেই হল না। কিন্তু রডনির কথা উঠলেই ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে, বলে, ও আমার শনি, আমার সব খেয়েছে।

আমার মনের কথা জানলে আজকের এই সারা ক্ষেপেই উঠবে। আজ অন্তত আমার জীবনে ওদের আবির্ভাব আশীর্বাদ বলে মানি। সম্ভব হলে ওদের আমি আমার সর্বস্ব (একমাত্র সারাকে ছাড়া) দিয়ে দিতে পারি।

আজকের কথা থাক।

রডনিকে এই প্রতিষ্ঠানে নিয়ে আসার কৃতিত্ব আমারই। এই রাজ্যে তার তখন নাম-ডাক খুব। বাঘ-সিংহের খেলা তখন আমিই দেখাই। নামও আছে। কিন্তু ওরা কুকুর-বেড়ালের মতো পোষ মানা

জীব আমার। ওরা আমাকে ভালোবাসে আমি ওদের ভালোবাসি। খেলার মধ্যে সেটাই বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হিংস্রতম প্রাণীকেও সহজে পোষ মানানোর বিদ্যেটা আমার শ্বশুরের কাছে শেখা।

কিন্তু চুপি চুপি দেখে এসেছি, রডনির খেলা চমকপ্রদ। হিংস্র প্রাণীগুলোকে ও ক্ষেপিয়ে নাচিয়ে কুঁদিয়ে অস্থির করে ছাড়ে, প্রতি-মুহূর্তে রোমাঞ্চ ছড়ায়, তারপর সদর্পে ইচ্ছেমতো ওদের ওঠায়, বসায়, ছুটোপুটি করায়। এর থেকেও বিচিত্র আমার মতে ওর তিরিশ গজ মোটর-জাম্পের খেলা। লাফাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ও যখন মোটরে গিয়ে বসে—মাঝের দীর্ঘ ফারাকটা দেখে মনে হয় জীবন আর মৃত্যু একাসনে গিয়ে বসল। এখন কে জেতে কে হারে।

লোকটার মেয়ে-সংক্রান্ত দুর্নাম শোনা ছিল কিছু। চেহারায় আর শৌর্যে-বীর্যে রমণী-বল্লভই বটে। ও বলে দুর্নামের খোরাক জুগিয়েছে ওর মহিলা-স্তাবকরাই। আমি অবিশ্বাস করিনি। লোকটা বেপরোয়া বলেই সমাদরের পাত্র। শুনলাম যেখানে ছিল, সেখানকার মালিকের এক মাননীয়া অতিথিকে নিয়েই খটাখটি। শোনামাত্র আমি ওর কাছে ছুটে গেছি এবং টোপ ফেলেছি।

পয়সার দিক থেকে আমাদেরও কম নামী প্রতিষ্ঠান নয়। তার ওপর এই গুজবও রটেছিল যে কর্মচারীরাই শিগগিরই এর অর্ধাংশের মালিক হবে। এই উদার পরিকল্পনাও আমারই। কর্মচারীরা মিছিমিছি আমার 'আবর্তমানে'র আশায় দিন গুনবে কেন—সংগঠন জোরদার হলে আমার 'বর্তমানে'ই তাদের অর্ধাংশের মালিকানা দিতে আপত্তি নেই। আমার অবর্তমানে সারা বাকি অর্ধাংশ পাক। কিন্তু কবে পর্যন্ত এই পরিকল্পনা রূপ নিতে পারে, স্থির করিনি। ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে অ্যাটর্নির সঙ্গে-আলাপ-আলোচনাই চলছিল শুধু।

দু'পাত্র দামী মদ পেটে পড়তে রডনি ওয়েনস্টনের মেজাজ প্রসন্ন হয়ে উঠল। আমি আরো মদের ঢালাও অর্ডার দিয়ে কর্মীদের ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির দিকটাই ওর চোখে লোভনীয় করে তুলতে চাইলাম। তাছাড়া, সত্য বর্তমানে সে যা পায় তার থেকেও আমরা বেশী ছাড়া কম তো

দেবই না।

মদে চুর হয়ে রডনি ওয়েনস্টন টোপ গিলল। রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ওখানে আবার স্পর্শকাতব রূপসী মহিলা নেই তো কেউ?

আমি পাল্টা রসিকতা করেছি, আমি কেমন কালো ভূত দেখতেই পাচ্ছ, কিন্তু আমার বউটাকে মোটামুটি রূপসী বলতে পারো। তোমাকে দেখে উল্টে সে না স্পর্শলোভাতুর হয়ে ওঠে আমার সেই ভয়।

হ্যাঁ, খাল কেটে আমিই কুমীর এনেছি।

এক কথায় রডনি ওয়েনস্টন এসেছে এবং স্বভাবগত দাপটে সরাসরি সকলকে বশীভূত করেছে। আমার তাতে আপত্তি নেই। ও আসার এক বছর বাদে আমি আগের আর পরের হিসেব মিলিয়েছি—লাভের অঙ্ক ঢের মোটা। ও নিজেও তা অনুমান করতে পারে। এক-দিন হেসে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কর্মচারীদের প্ল্যান কি হল?

আমি বলেছি, হবে—সবুর, সবে তো এক বছর এসেছ। আর বাড়তি লাভের একটা মোটা অংশও তো তুমি একাই গিলছ।

ওর বাড়তি দাম দিতেও আমি কার্পণ্য করিনি। এ-জিনিস আমার কর্তার কাছে শেখা।

রডনি ওয়েনস্টন চালাক মানুষ। এক বছরের মধ্যে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা ভালই বুঝে নিয়েছে। বোমারের সঙ্গেও তার খাতির খুব, কিছু আভাস তার কাছেও পেয়ে থাকবে। ক্রমে সারার প্রতি ওর একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর ওপর আমি বিরূপ হইনি। বরং এক-ধরনের আক্রোশ চেপে সারার দিকে নজর রেখেছি।

আমার প্রতি বিদ্বেষবশতই হয়তো কোন কর্মচারীর প্রতি সারা কৃপাদৃষ্টি বর্ষণের পক্ষপাতী ছিল না। মনে মনে আমার সঙ্গে তাদের খুব তফাত ভাবত না। রডনির সঙ্গে আচরণেও সকলের মনিব-কন্যাসুলভ মর্যাদার ফারাক রেখে চলতে চেষ্টা করত। কিন্তু রডনির বেপরোয়া ব্যবহারে আর ঠাসঠোস কথাবার্তায় সে মর্যাদা-বোধে

অনেক সময় ঘা পড়ত। ক্রমে আমার মনে হতে লাগল সারার চোখেও লোকটার পুরুষকারই বড় হয়ে উঠছে। তার প্রতি ওর দৃষ্টি একটু যেন উৎসুক।

একবার আমরা দিন পনেরোর একটা ছোট ট্যুরে বেরিয়েছিলাম—মনের খেলার তখনই প্রথম সূচনা।

সে-রাতের বাঘ-সিংহের খেলায় রডনি একটা নতুন চমক দেখিয়েছে। সিংহের গলায় দড়ি বেঁধে তার পিঠে চেপে বসেছে—আর সেই দড়ি মুখে করে বাঘে টেনেছে। দেখে দর্শকদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেছল। এ-রকম অনেক কিছু ওর মাথায় আসে। সব শেষে শেষে মোটর-জাম্পের মারাত্মক খেলা তো আছেই।

খেলা-শেষে একটু রাত অবধি আমি নিজের ক্যাম্পে বসে হিসেব দেখছিলাম। ওদের তখন খানা-পিনা হৈ-হুল্লোড় চলছিল। ঘটনাটা আমি পরদিন শুনলাম বোমারের মুখ থেকে।

...ওই খানা-পিনার সময় সারা অন্তরঙ্গ খুশী মুখে রডনিকে অভিনন্দন জানাতে গেছল। রডনি তখন বেশ কয়েকপাত্র গলায় ঢেলেছিল। অতএব হঠাৎ তার এত আনন্দ হল যে দুহাতে আচমকা সারাকে বুকে টেনে এনে জাপটে ধরে চুমুর পরে চুমু। পাঁচ জনে মিলে টানাটানি করেও সারাকে ছাড়িয়ে আনতে পারে না—এমন চুমুর ঘটা। ছাড়া পেয়েই সারা তার গালে ঠাস করে এক চড়।

হেসে হেসে বোমার মাতালের কাণ্ড বিস্তার করেছে। শেষে একটা চোখ পিট পিট করে বলেছে, কিন্তু দোস্ত, আমার কেমন মনে হচ্ছে ও-রকম কাণ্ড করার মতো মাতাল রডনি কাল রাতে হয়নি।

শুনে আমার মাথায় কি খুন চেপেছিল? একটুও না। আমি বরং এতদিনে খুশী হবার মতো একটা হিংস্র খোরাক পেয়েছিলাম।

পরে ঈষৎ সঙ্কোচে সারা জিজ্ঞাসা করেছে, কাল রাতে রডনির কাণ্ড শুনেছ?

অনেকের চাক্ষুষ দেখা ব্যাপারটা আমারও অজানা থাকবে না, তাই বুদ্ধিমতীর মতো ও নিজেই এসে বলেছে।

—কি করল আবার, কাল তো ভালো খেলা দেখিয়েছে।

—আর বোলো না, ওটা একটা অসভ্য জানোয়ার—ওটাকে তাড়াও।

অপ্রতিভ মুখ করে জানাল কি করেছে মদের ঝোঁকে, কিন্তু বোমারের মতো করে বলল না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, খুব বেশি মদ গিলেছিল?

—বেশি মানে! মদে চুর হয়েছিল একেবারে, নইলে এরকম করে!

আমি হেসে বললাম, দৃশ্যটা কেবল আমি বেচারা দেখতে পেলাম না।...আজ মাথা ঠাণ্ডা হলেই এসে মাপ চাইবে তোমার কাছে।

...সেই সূচনা খুব সংগোপনে পল্লবিত হয়েছে। সারার সব থেকে বড় অসুবিধে এই যে নিজেকে ও এক বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়ে রেখেছে। আমাকে বাতিল করার ফলে সেই মর্যাদা ওর আরো বেড়েছে ধরে নিয়েছে। অতএব ওর বিবেচনায় গোপনতা একান্তই প্রয়োজন।

বোমার মাঝে-মাঝে আমাকে দুই একটা রসের খবর দেয়। সারার সে একান্ত বিশ্বাসের পাত্র অতএব রডনিও তার সম্পর্কে খুব বেশি সাবধান নয়। সেদিন বোমার তার পল্‌কা মেজাজের ভঙ্গিতে বলল, ভাব-গতিক সুবিধের লাগছে না বন্ধু, একটু যেন লেন দেনের চেষ্টা চলছে।

—কি-রকম?

শুনলাম কি-রকম। সারা তখন রডনির ক্যাম্পে বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল। বোমারও কাছেই ছিল। বিকেলের খেলা দেখাবার আগে রডনি অল্প-স্বল্প মদ খায়—তাই খাচ্ছিল। আর সে জন্য সারা তাকে ধমকাচ্ছিল। (আমার নিজের মদের মাত্রা বাড়ছে সারা জানে, কিন্তু কোনদিন তা নিয়ে একটা ভ্রুকুটিও করেনি।) রডনি হঠাৎ বলে বসল, এখানকার কাজ ছেড়ে পালাতে হবে, সেদিন ওই কাণ্ড করে বসার পর মদ মুখে দিলেই আবার আমার ওইরকম করতে ইচ্ছে করে।

বোমার উপস্থিত, তাই সারা সচকিত। ভুরু কুঁচকে থমকেছে, তোমার জিভ আমি টেনে ছিঁড়ব—

রডনি জিজ্ঞেস করেছে, হাত দিয়ে না দাঁত দিয়ে?

নিরুপায় সারা তখন বোমারের দিকে ফিবে বলেছে, ও খেলা দেখাবে কি, এরই মধ্যে কেমন নেশা চড়িয়েছে, দেখলে?

এর পর থেকে বোমারকে আমি আমার ক্যাম্পে আসতে নিষেধ করেছি। সকলে জানুক আমি একটু একটু করে বিরূপ হয়ে উঠছি ওর ওপর। বিশেষ করে, সারা জানুক আর রডনি জানুক। তাতে আমার সুবিধে হবে, বোমার ওদের আরো বেশি বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠবে।

আমার মতলব বোমার তক্ষুনি বুঝে নিয়েছে। একটা চোখ পিট পিট করে হতাশার সুরে বলেছে, কর্তার আমলেও এই করেছি, আবার তার জামাইয়ের আমলেও এই নসিব।

আগামী দিনের চিত্রটা আমি কল্পনা করতে চেষ্টা করেছি। কল্পনা করতে পেরেছি। তেমনি হিংস্র আনন্দে মনে মনে আমি তাকে স্বাগত জানিয়েছি, কিন্তু সেখানে কি আমার ভূমিকা আমি জানি না।

রডনির মগজে কিছু নেই এ তার শত্রুও বলবে না। সারা সহজলভ্য হতে পারে না এটুকু বুদ্ধি তার আছে। আরো মাস কয়েকের অন্তরঙ্গ খুঁটিনাটির পর মাথা খাটিয়ে সে হঠাৎ একদিন এমন চমকপ্রদ হতাশার কথা বলল যে, শুনে আমিও তারিফ না করে পারলাম না।

এর দিনকতক আগে থেকে মেয়েদের সম্পর্কে ওর মুখে অনেক অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের কথা শোনা যেতে লাগল। মেয়েরা ভীরু, কোন চমকপ্রদ কিছুতে তাদের টানতে গেলে আগে থাকতেই ভয়ে তাদের প্রাণ খাঁচা-ছাড়া, ইত্যাদি। আমি ওকে উসকে দিই, কেন, আমাদের ইউনিটের মেয়েরাই তো কতো কঠিন-কঠিন খেলা দেখাচ্ছে।

—দূর—দূর—দূর। তার মধ্যে চমক আছে? ওরিজিন্যালিটি কিছু আছে? সব অভ্যাসের গোলামি। শেষে মনের ক্ষেদ ব্যক্তই করে

ফেলল একদিন, বলল, এই দেখো না, এতদিনেও আমি মনের মতো পার্টনার পেলাম না একজন যে সাহস করে তার প্রাণটি আমার হাতে ছেড়ে নিতে পারে—অথচ দিনের পর দিন নিজের চোখে দেখেছে, আমি বেঁচেই আছি, মরে যাচ্ছি না।

সারা উৎসুক চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। তীর যে রডনি ওর উদ্দেশেই ছুঁড়ছে তাও বুঝতে পারছে হয়তো। আমি বুঝে নিতে চাইলাম, পুরুষ পার্টনার খুঁজছ, না মেয়ে পার্টনার?

মুখবিকৃত করে রডনি ঝাঁঝিয়ে উঠল, এসব আইটেমে ছুটো পুরুষ কখনো পার্টনার হয়?

—কোন সব আইটেমে?

—আমার মোটর-জাম্পের আইটেমে। সেই একই জিনিস করছি, অথচ পাশে একটি মেয়ে বসে থাকলে ওই একই জিনিসের কি মার-মার কাট-কাট ব্যাপার হবে ভাব একবার। সাহস করে সে-মেয়ে শুধু স্ট্র্যাপ বেঁধে পাশে বসে থাকবে আর শুধু বিশ্বাস করবে আমি যখন মরছি না তখন তারও মরার কোন কারণ নেই।···মোটর-জাম্পের খেলায় মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে নেমেছে এ কথনো শুনেছ? এই সামান্য ব্যাপারটা কেউ ভেবেছে কখনো? অথচ এই সামান্য তফাতে তোমার টাকার বাণ্ডিলটা কতগুণ মোটা হতে পারে ভাব একবার।

মিথ্যে বলেনি। ও বলার সঙ্গে সঙ্গে এই রোমাঞ্চ আমি কল্পনা করতে পারি। সারার দিকে তাকালাম। আগ্রহে আর চাপা উত্তেজনায় ওরও ছু'চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। বলে উঠল, এই পার্টনার তুমি পাচ্ছ না?

জবাবের বদলে রডনি গলা দিয়ে ফু করে তাচ্ছিল্যের শব্দ বার করল একটা। হালকা করে সব থেকে বড় ইন্ধন এবারে আমিই জোগালাম। সারার দিকে ফিরে বললাম, মেয়েদের এ-রকম দুর্নাম দিচ্ছে রডনি, তুমিই চেষ্টা করে দেখো না—ভয়ের কি আছে, ও তো নিজের প্রাণের মায়াতেই বেঁচে থাকতে চেষ্টা করবে। মাঝখান থেকে ইউনিটের নাম ফাটবে।

উত্তেজনা চেপে সারাও তেমনি হালকা চ্যালেঞ্জ ছুড়ল, পারি না ভাবছ ?

রডনি টিপ্পনী কাটল, একেবারে জল-ভাত ব্যাপার, তবে মহড়া দিতে গেলেই হার্টফেল করার ভয় আছে।

সারা তাড়া দিয়ে উঠল, মেয়েদের হার্ট সম্বন্ধে তোমার কত জ্ঞান !

উত্তেজনা ভালো মতো মাথায় ঢুকেছে সারার। এরপর মাঝে মাঝেই এ-খেলার সম্ভবনা সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ দেখা গেল। অস্বাভাবিক নয়, শুয়ে বসে দিন কাটানোর বদলে এ-রকম একটা রোমাঞ্চকর খোরাক পেলে কার না লোভ হয় ? বলা বাহুল্য, আমি উৎসাহ জুগিয়েছি।

এরপর মহড়া শুরু হল ওদের রডনি বোঝালো খুব আস্তে আস্তে ব্যাপারটা ধাতে সইয়ে নিতে হবে। প্রথমে স্থাণুর মতো বসে থাকতে শিখতে হবে, তারপর স্পাঁড-নসিয়' কাটাতে হবে, তারপর ছোট থেকে খুব ধীরে ধীরে বড় লাফে অভ্যস্ত হতে হবে। এমন অভ্যস্ত হওয়া দরকার যেন মাঝের অতবড় ফারাকটাও আর চোখেই না পড়ে।

খুব স্বাভাবিক কথা। কিন্তু এই ট্রেনিং শেষ হতে যে দু'বছর কেটে যেতে পারে আমার ধারণা ছিল না। বিশেষ করে সঙ্গিনীর কাজ যখন শুধু পাশে বসে থাকা। কিন্তু রডনি চতুর মানুষ, সে জানে খেলা একবার শুরু হয়ে গেলে তখন আর মহড়ার সুযোগ থাকবে না। রমণী-চিত্তজয়ের মহড়াটি তার মধ্যে শেষ করে নিতে হবে। সে-পর্ব জমাট বাঁধছে টের পাই। সারার চোখে পুরুষোত্তমই হয়ে উঠছে রডনি। সে যে-পথে হাঁটে, সেদিকে ওকে মুগ্ধচোখে চেয়ে থাকতে দেখি। মাঝে মাঝে ওদের মানাভিমান আর তারপরের অন্তরঙ্গ আপোসের সংবাদও কানে আসে।

বোমার এক বিচিত্র মানুষই বটে। অদ্ভুত অনায়াসে সে তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। এমন নিখুঁতভাবে যে মাঝে মাঝে সন্দেহ হত ওদের দলে ভিড়ে ও আমাকেই ঠকাচ্ছে কি না, আসলে আমার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করছে কি না। সকলে জানে আমি ওর ওপর

খড়্গহস্ত এখন। ওর কোনো কাজ ভালো দেখি না, সামান্য ফাঁক পেলে ক্ষেপে যাই।

সারার কাছে ক'দিন ওকে বিদায় দেবার প্রস্তাবও করেছি। বলেছি, ওর ভাঁড়ামি আর ভালো লাগে না, এদিকে কুঁড়ের বাদশা হয়ে উঠছে দিনকে দিন—ওকে দিয়ে আর চলবে না।

—সেকি! সারা আকাশ থেকে পড়েছে। ওকে দেখলেই তো লোকে হেসে সারা—তুমি ভিতরে থাকো টের পাও না।

—তাহলেও ওকে আমার ভালো লাগে না।

সারা ফুঁসে উঠেছে, বাবার অমন আদরের লোকটাকে মিছিমিছি তাড়াতে চাও তুমি—কেমন? রাগের মুখে সেদিন বলেই বসেছিল, কেন ওর ওপর তোমার অত রাগ আমি বুঝি না ভেবেছ? ওর কাছে ছোট হয়েছ তবু লজ্জা করে না তোমার এ-কথা বলতে?

আমার এত রাগের কারণ সারা জানে বই কি। সারা জানে, বোমারকে আমি ওদের দুজনের ওপর চোখ রাখতে বলেছিলাম—ওর আর রডনির ওপর—আর বোমার আমার মুখের ওপর এই নোংরা কাজ করতে অস্বীকার করেছে। এ-কথা বোমারই ওদের বলেছে। তাই বোমারকে ওরা ওদের চক্রের অতি বিশ্বস্ত একজন বলেই জানে।

সেই রোমাঞ্চকর দিন এলো।

তখন আমরা পূর্ব-জার্মানীতে। কাগজের বিজ্ঞাপনে পোস্টারে সিনেমা স্লাইডে সেই অভিনব আইটেমের উদ্বোধন ঘোষণা করা হল। মনে যা-ই থাক, আমি ব্যবসা বুঝি। দর্শকচিত্তে রোমাঞ্চ যোগানোর ব্যাপারে কার্পণ্য করি না।

প্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল। সাফল্যের আনন্দে জীবন সার্থক সারা কার্টারের।

দামী স্যুইট ভাড়া করা সত্ত্বেও বেশির ভাগ দিনই আমি ক্যাম্পে থাকি। খেলার পর হিসেবপত্র দেখি। তারপর দেদার মদ খেয়ে আর নড়া-চড়ার ক্ষমতা থাকে না। শ্বশুর তার এই স্বভাবটারও গোটাগুটি

উত্তরাধিকারী করে গেছে আমাকে।

সেই রাতে রডনি ওয়েনস্টন তার বহু প্রত্যাশিত পুরস্কার লাভ করেছে। এর আগের খবর জানি না। কারণ বোমার জানে না। বোমারের কেমন সন্দেহ হতে একটু বেশী রাতে সারার স্যুইটে গিয়ে হাজির। সারার আগ্রহেই সে ওর কাছাকাছি থাকে।...ঘর বাইরে থেকে বন্ধ। অর্থাৎ ভিতরে কেউ নেই। চারটে ব্লক ছাড়িয়ে তারপর রডনির স্যুইটে গেছে। তার ঘর ভিতরে থেকে বন্ধ।

ব্যবস্থামতো সকলের অগোচরে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়েও চট করে কিছু বলতে পারেনি। রাগে মুখ গোঁজ করে ছিল। আমার বিরক্তি দেখে শেষে ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, আমি ভেবেছিলাম এতটা রশি ছেড়েছ যখন কিছু একটা মতলব আছে তোমার, সময়ে রশি টেনে নেবে—কিন্তু এদিকে শেষ খেলা খতম—এখন কি করবে?

কি করব আমি জানি না। সেই থেকে নিজের হাতে চকচকে একটা ধারালো ছোরা দেখছি আমি। আর এক রমণীর নরম নগ্ন বক্ষ দেখছি। আর তারপর ফিনকি দিয়ে তাজা লাল রক্ত ছুটতে দেখেছি। সেই উষ্ণ রক্ত যেন আমার চোখে-মুখে এসে লাগছে।

বোমারের কাছে গোপন কিছু নেই, এই প্রণয়াভিসার আরো কিছুদিন চলার পরে সারা সেটা বুঝেছে। না, মায়ের প্রেমিকের কাছে সে অস্বীকার করেনি। বলেছে, রডনি তার কাছে দুনিয়ার একমাত্র পুরুষ, রডনি তার ধ্যান-জ্ঞান—রডনিকে ছাড়া ও বাঁচবে না—আমার মতো মানুষের ঘৃণ্য সংশ্রব থেকে কি করে সে অব্যাহতি পেতে পারে সেই পরামর্শ আর সেই সাহায্য চেয়েছে।

তিনজনে মিলে অনেক দিন অনেক পরামর্শ করেছে তারপর। কূল-কিনারা মেলেনি। বোমারের ধারণা, ওদের দুজনের সায় পেলে রডনি আমাকে এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবারও মতলব ভাঁজতে পারে। সারার সঙ্গে এরপর তুচ্ছ কারণে খিটির মিটির বাধতে লাগল আমার। আমার কোনো কাজ কোনো ব্যবস্থাই ওর পছন্দ হয় না। তর্ক বাড়লে ও গালাগালও করে ওঠে। শিক্ষা-দীক্ষার খোঁচা দেয়, কি

ছিলাম আর ওর বাবার দয়ায় কি হয়েছি সে-কথা বলে। প্রতিষ্ঠান-কর্মীদের নামে অর্ধেক মালিকানা লেখাপড়া করে দিচ্ছি না কেন, এ নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া বাধে।

পরের একটা বছর ও আমাকে মদে ডুবে থাকতে দেখেছে। শরীরও মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আমার স্পষ্ট মনে হয়েছে ওরা তাতে খুশী ছাড়া দুঃখিত নয়। আমার মাথায় নানান রকম মতলব ঘোরে। নিজের হাতে সেই চকচকে ছোরা, রমণীর সেই অনাবৃত নরম বুক, আর সেই তাজা রক্ত আরো বেশী ছাড়া কম দেখি না। অথচ ভিতর থেকে কে যেন কেবল বলে, সবুর সবুর—তাড়া কিসের? আরো দেখো, আরো মজা লুটতে দেখো।

এই মজা দেখতে দেখতেই আরো দুটো বছর কাটল। কি খেয়াল হতে খুব মনোযোগ দিয়ে এবার কর্মীদের অর্ধেক মালিকানার খসড়া তৈরি করলাম। বলা বাহুল্য, সেই তালিকার সর্বপ্রধান নাম রডনি ওয়েনস্টন।

সারা বলল, আমিও এখন বিশিষ্ট কর্মীই একজন, আমার নাম বসাও।

বসালাম।

বোমারের নাম কোথায়?

ঝকাঝকির পর তার নামও বসানো হল—বাদ বলতে গেলে প্রায় কেউই থাকল না।

শেষে আমি বললাম, সব ঠিক হয়ে থাকল, কিন্তু সই এখন হবে না।

—কেন? কেন হবে না?

—পরে হবে।

—কত পরে?

—দেখি···

—ও! সারা ঝলসে উঠল।—তোমার লোভ আমি জানি না? ভাঁওতা দিয়ে দিয়ে কেবল সময় কাটাচ্ছ—তোমাকে আমার চিনতে

বাকি ?

আমার মাথায় রক্ত উঠছে। হাত দুটো নিশপিশ করছে। এতদিনে ওদের প্রণয়-কাণ্ড সকলেই আঁচ করতে পারে। মুখে কেউ কিছু বলে না। সশ্লেষে জবাব দিলাম, না, আমাকে চিনতে বাকি নেই, কিন্তু নিজেকে চিনেছ তো? রাস্তার কুকুরের প্রেম দেখার মতো যে মজা লুটছে সবাই।

—কি ? কি বললে তুমি ? হিংসেয় কালো মুখ কালি হয়ে যাচ্ছে —কেমন ? রডনির পায়ের নখের যোগ্য তুমি ?

মাথার মধ্যে কি হয়ে গেল জানি না। দুই কাঁধের ওপর দুটো থাবা বসাতেই ও ছিটকে উঠে দাঁড়াতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুকে জাপটে ধরে ওকে শূন্যে তুলে ফেললাম আমি। দাঁতে করে ওর মুখ চেপে ধরে সোজা নিজের ঘরে নিয়ে এসে নরম শরীরটাকে শয্যার ওপর আছড়ে ফেললাম। চোখের পলকে দরজা বন্ধ করে ড্রয়ার থেকে রিভলভার বার করে সামনে ধরলাম।—টুঁ-শব্দ বেরিয়েছে কি সব খেলা আজ খতম করে দেব।

হাতের নির্মম ক্রূর টানে ওর বাইরের জামা ছেড়ে অন্তর্বাস সুদ্ধ ছিঁড়ে দু'ফাঁক হয়ে গেল। আর্ত বোবা ত্রাসে ও আবার সেই পুরনো ঘাতককে দেখল।

হিংস্র নিষ্পেষণে ও ডুকরে উঠল, ঈশ্বরের নাম নিয়ে তুমি কি শপথ করেছিলে ?

—ঈশ্বরের নাম ? ওই নাম মুখে আনতে তোমার লজ্জা করে না ? শপথের কোনো দাম তুমি দিয়েছ ? এতটুকু সম্মান দিয়েছ ?

সারা বলে উঠল, ঈশ্বরের নামে শপথ তুমি করেছিলে, আমি নয়। দাম তুমি দেবে, সম্মান তুমি দেবে—আমি নয়।

সেই নিদারুণ আক্রোশের মধ্যে কি-রকম ধাক্কা খেতে লাগলাম আমি। ওই বিপরীত অনুভূতিটাকে সরোষে ভিতর থেকে উপড়ে দিতে ফেলে চাইলাম। কিন্তু পারা গেল না। গেলই না।

...হ্যাঁ, শপথ আমি করেছিলাম। ঈশ্বরের নামে শপথ। ও নয়।

ভিতরে কে যেন বার বার এই কথাই বলতে লাগল।

ছেড়ে দিলাম ওকে। ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালাম।

ছুই চোখে এক ঝলক ঘৃণা উপছে ভয়ার্ত শশকের মতোই ও চলে গেল।

। নয় ।

নাটকের শেষে চরিত্র গার্টি। গার্টি আলভা।

এই জীবন-নাট্যে সব থেকে নাটকীয় চরিত্রই বটে।

আগুনপানা মেয়ে।

আগুনের মতো রং, আগুনের মতো রূপ, আগুন-ঠিকরনো চোখ। ওর জিভের ডগায় আগুন, আমার মনে হয় ওর বুকের তলায়ও অনির্বাণ আগুন।

আগুনের খেলা দেখায়। জ্বলন্ত মশাল নিয়ে লোফালুফি করে, দাঁতে কামড়ে ধরে, গনগনে জ্বলন্ত আগুনের চাকতির মধ্য দিয়ে হেসে খেলে নেচে বেড়ায়। ওই মেয়েকে দেখে আর ওর খেলা দেখে দর্শক স্তব্ধ হয়ে থাকে।

দীর্ঘকাল, বলতে গেলে ছেলেবেলা থেকেই সাউথ আফ্রিকায় ছিল। আগুনের খেলা সেখানেই শিখেছে। তারপর যোগ্য হাতে পড়ে সে-শিক্ষার চমকে বেড়েছে। সাউথ আফ্রিকা থেকে যে-লোকের সঙ্গে পালিয়েছিল, সে আবার একদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে সরে গেছে। টানা দেড় বছর এক মানসিক হাসপাতালে ছিল গার্টি আলভা। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে আবার কাজের সন্ধানে বেরিয়েছে এবং প্রথমেই এইখানে এসেছে।

প্রথম সাক্ষাতে ও নিজেই আমাকে এ-সব কথা বলেছে। নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে।

গার্টির তীক্ষ্ণ রূপের মধ্যে এমন কিছু আছে যা শঙ্কা জাগায়,

আবার টানেও। ও যখন হাসে, ওর ঝকঝকে দাঁতগুলো দিয়েও যেন সাদা আগুন ঠিকরোয়।

নিরিবিলিতে আর্টিস্ট যাচাইয়ের ব্যবস্থা আছে। আমি একলাই খেলা দেখলাম ওর। দেখে সত্যিই তাজ্জব আমি। দর্শক-চোখে এরও কদর কেমন হতে পারে আমি তক্ষুনি অনুমান করে নিয়েছি।

এক সপ্তাহ বাদে আসতে বলাম ওকে। এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নিলাম। যা শুনলাম ভয়ের ব্যাপার বটে। সত্যিই কালো মানুষের সঙ্গে পালিয়েছিল ও জীবনের মায়া ছেড়ে। কিন্তু সেই লোকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ওর মাথায় খুন চেপে যায়। তারপর থেকে কালো মানুষ দেখলেই ও তাকে হত্যা করতে চায়। ক'টা লোক যে ওর হাতে মরতে মরতে বেঁচেছে ঠিক নেই। তার মধ্যে এশিয়া আর ভারতের লোকও আছে।

এখন সে সুস্থই বটে।

কেন যেন বেশ আগ্রহ সহকারেই ওকে আমি নিয়ে নিলাম ঃ ভাবতে চেষ্টা করলাম, ওর খেলার চমকের দরুনই আমার আগ্রহ। তবু ঠিক যেন তা নয়। সমস্ত সপ্তাহ ধরেই গার্টি আলভার প্রতীক্ষায় আমি উন্মুখ হয়ে ছিলাম।

আসা মাত্র মোটা মাইনের চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নিলাম। ও খুশীতে আটখানা। ঝুঁকি আমার একটা হাত ধরে বলে উঠল, আমাকে তোমার খুব পছন্দ হয়েছে—না?

বললাম, তোমার খেলা ভালো লেগেছে। দর্শকদেরও যাতে ভালো লাগে সেদিকে নজর রেখো।

—ফুঃ! তারা আমাকে দেখেই পাগল হয়, খেলা দেখলে তো কথাই নেই। এত লোক পিছনে লাগবে যে শেষে আমার জন্য বডি-গার্ড রাখতে হবে তোমাকে দেখো। সব জায়গায়ই তাই হয়েছে। আরো একটু সামনে ঝুঁকল, ফিসফিস করে বলল, তোমাকেও প্রথম দেখেই আমার খুব ভালো লেগেছে—বুঝলে? কাজ আমি যেখানে যাব সেখানেই পাব, কিন্তু তোমাকে ভালো লেগেছে বলে সাতটা দিন

আমি অপেক্ষা করেছি। হেসে উঠল, সুন্দর দাঁতগুলো ঝকমকিয়ে উঠল, আমাদের দেশে কালো-সাদার গণ্ডগোল জান তো—কিন্তু আমি যে কালো মানুষের সঙ্গেই পালিয়েছিলাম।

হাসপাতাল থেকে যা-ই বলুক, পাগলের পাল্লায় পড়লাম কিনা আমার সেই সংশয়।

গার্টির আবির্ভাব প্রতিষ্ঠানের লোকের কাছেও চমকের মতোই বটে। তাকে আমি বিনা প্রচারে আসরে নামিয়েছি। গার্টি একটুও অতিশয়োক্তি করেনি। প্রথম দিনেই ওর কেরামতি দেখে আসর মাত। আগুন-বরণ পোশাকে আগুনের খেলায় অনেকেরই চোখ বুক ঝলসে দিয়েছে গার্টি আলভা।

সারা সাদাসিধে ভাবেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ওকে আবার কোত্থেকে জোটালে?

আমি উৎফুল্ল।—কেন,.ভালো লাগেনি?

—ভালোই তো ···।

কিন্তু ওর প্রশংসায় উত্তাপ ছিল না। প্রতিষ্ঠানে এতদিন ওর থেকে সুন্দরী কেউ ছিল না। কিন্তু গার্টি আলভার রূপ একেবারে আলাদা জিনিস। পুরুষ মানুষের ভিতর-বার ধাঁধিয়ে দেয়। তাছাড়া সারাকে যত কচিই দেখাক, গার্টির তুলনায় বয়েস হয়েছে।

ছ-মাসের মধ্যে গার্টি আলভা নিজের জোরে আর দাপটে প্রতিষ্ঠানের প্রথম সারির একজন হয়ে দাঁড়াল। খাতির ওর সব থেকে বেশী আমার সঙ্গেই, সারা তাও লক্ষ্য করেছে কারণ গার্টির অন্তরঙ্গ আচরণে রাখা-ঢাকা কিছু নেই। কিন্তু সারার তাতে আপত্তি কিছু নেই, ওর আসল উদ্বেগের হেতু আমি জানি। রডনি যে-প্রকৃতির মানুষ তাতে ওই গোছের বেপরোয়া আগুন-পানা মেয়ের দিকে ওর ছোটা স্বাভাবিক। রডনির দুর্বলতা আমি টের পাচ্ছি, সারাও নিশ্চয় পাচ্ছে।

ভিতরে ভিতরে আমার উৎকট আনন্দ। ক্রুদ্ধ মুখে গার্টি সেদিন আমাকে এসে বলল, রডনিটা একটা বাঁদর, আজ আমাকে ধরে চুমু

খেতে চেষ্টা করেছিল। আমি খিমচে পালিয়ে এসেছি।

আমি বললাম, বাঁদরে কখনো চুমু খায়—ও ভালোমানুষ, এখানকার সব থেকে বড় স্টার।

দুদিন বাদে সারা গজগজ করে আমাকে বলল, এই পাগলী রূপসীকে ঢুকিয়ে তুমি ভালো করোনি—মিনিয়ালগুলোকে পর্যন্ত লোভ দেখিয়ে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমি জবাব দিয়েছি, গার্টি আমাদের অ্যাসেট।

এর কিছুদিন বাদেই কর্মীদের মালিকানার তালিকায় গার্টি আলভার নাম বসিয়েছি। দেখে সারা গম্ভীর। রডনি মনে মনে খুশি। গার্টি আনন্দে আটখানা। ওব আনন্দের সেই জের সামলাতে আমি নাজেহাল।

আরো বছরখানেক গার্টিকে আমি রডনির কাছ থেকে আগলে রেখেছি। বাঘের মুখের সামনে খাবার রেখে তাকে খেতে না দেবার সঙ্কল্প আমার। বাসনায় জ্বলে জ্বলে ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক।

তাই উঠেছিল। তার পরেই গার্টির সম্পর্কে আমি উদাসীন

ক'দিন না যেতেই তার ফল পেলাম। হঠাৎ রাত দুপুরে আমার ক্যাম্পে ঢুকে গার্টি শয্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরল আমার। বলে উঠল, তুমি ভালো, রডনিটা বজ্জাত, ওকে আমি লাথি মেরে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম।

আমি ওকে শয্যা থেকে তুলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও আমার গলা আঁকড়ে ধরল। শেষে ক্রুদ্ধ হ্যাঁচকা টানে সরালাম ওকে। বললাম, বেশী বাড়াবাড়ি করলে শাস্তি পাবে।

ও হাসতে লাগল।—কি শাস্তি?

—আমার একটি চাবুক আছে, এসব বেহায়াপনা শুরু করলে বিপদ হবে। আমি বিবাহিত মনে রেখো।

গার্টি ঝলসে উঠল। ও! কি বিবাহিত আমার! তোমার বউ যে ওদিকে দিন-রাত রডনির সঙ্গে ঢলাঢলি করছে?

জবাবে ওকে আমি ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলাম।

হ্যাঁ, সেই থেকে ওর চোখে খুন ঝলসাতে দেখছি আমি। এক কালো মানুষের জন্য ও ক্ষিপ্ত হয়েছিল...আবারও তাই হল বুঝি।

প্রাচ্যভূমির সঙ্গে আমার ভাগ্যের যোগ্য।

দীর্ঘকাল বাদে সম্পূর্ণ ইউনিট নিয়ে আবার আমরা এদিকে এসেছি।...

নাটকের শেষ অঙ্ক দেখব বলে কি আমি প্রস্তুত ছিলাম? একটা চরম কিছু ঘটতে পারে সে-রকম আশঙ্কা মনের তলায় দানা বেঁধে উঠছিল বটে' দেহের সব ক'টা ইন্দ্রিয় আমি সর্বক্ষণ সজাগ রেখেছিলাম বটে। তবু ঈশ্বরের রাজ্যে যা ঘটে, মানুষ তার কতটুকু কল্পনা করতে পারে?

গার্টি আলভাকে অপমান করে তাড়াবার পর থেকে টানা দু'বছর ধরে আমি প্রত্যাশিত মানসিক বিপর্যয় লক্ষ্য করেছি। যেটুকু চোখের আগোচরে ছিল তাও যথাসম্ভব পূরণ করেছে ফ্র্যাংকি বোমার।

হতাশার প্রায় শেষ ধাপে নেমে এসেছে আমার স্ত্রী সারা কার্টার। একটা অদৃশ্য শূন্য পাথরে যেন মাথা খুঁড়ে চলেছে।

তার সব থেকে বড় শত্রু এখন আমি নই। শত্রু গার্টি আলভা। আর গার্টির সব থেকে বড় শত্রু আমি। সুযোগ পেলেই ও আমাকে হত্যা করবে, টুকরো টুকরো করে কাটবে। ওর সম্পর্কে বোমার আমাকে বার বার সাবধান করেছে। তবু ছলে কৌশলে তাড়ানো দূরের কথা, ওকে আমি প্রথম সারির তারকাদের মধ্যেই রেখেছি।

কারণ, আমি যা চেয়েছিলাম সেই রকমই ঘটেছে। ঘটছে। আরো কত কি ঘটতে পারে আমি জানি না।

আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে গার্টি আলভা প্রথম থাবা বসিয়েছে রডনির বুকে। পতঙ্গের মতো বাসনার আগুনে ওকে টেনে এনে পাগল করেছে। বিনিময়ে তার একমাত্র শর্ত, আমাকে নিঃশেষ করতে হবে, আমাকে ধ্বংস করতে হবে। কর্মীদের মালিকানার অংশ সত্যিই আমি লিখে দেব এ-বিশ্বাস তারা আর করে না। কিন্তু কাগজপত্র সব রেডি

আছে, আমাকে সরিয়ে দিতে পারলে মারভিন জেনট্রির উইলের বলেই সে-মালিকানা অনায়াসেই তাদের হস্তগত হবে।

সারার পায়ের তলা থেকে মাটি সরতে লেগেছে। প্রেমের ব্যাপারে সে সীরিয়াস মেয়ে। তার সমস্ত সত্তা বিকিয়ে আছে রডনির কাছে। রডনি ভিন্ন তার দুনিয়া অন্ধকার, বর্ণশূন্য। গোড়ায় গোড়ায় রডনি যতটা সম্ভব তার দ্বিতীয় প্রেমিকাকে আড়ালে রাখতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু গার্টি আলভা তো আগুনের ফুলকি, তাকে আড়ালে রাখা যাবে কেমন করে ?

তবু গোড়ায় ভরাডুবির এতটা বোঝেনি সারা। রডনির চাতুরী আর মোহ অনেকখানি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাকে। ক্রমশ সন্দেহ হয়েছে, ক্রমশ বুঝেছে। তাকে বুঝতে সাহায্য করেছে বোমার।

রাগে ক্ষোভে অপমানে যাতনায় ক্রমে দিশেহারা অবস্থা সারার। ওর কাছে রডনি ওয়েনস্টন একটা জীবন্ত জগত। নিজেকে এভাবে বিকিয়ে দেবার পর সে-জগতে আর কোনো রমণীর স্থান হতে পারে, ও কল্পনা করতে পারে না। রডনি তাকে বহুদিন আশ্বাস দিয়েছে, ওই মেয়েটা পাগল একটা, ওকে নিয়ে তুমি মাথা খারাপ করছ।

কিন্তু আমি আর বোমার জানি, পাগল সম্প্রতি রডনি নিজেই। কামনার আগুনে ফেলে গার্টি ওকে পাগল করে রাখতে পেরেছে।

সারার চোখেই বা কত কাল আর ধুলো দিয়ে কাটাবে ?

সারার পাশে আমি নেই, কারণ আমাকে সে কখনো চায়নি। তখনো চায় না। কিন্তু হতাশায় দু'চোখ স্থির তার, যখন মনে হল বোমারও তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। ওরা তিনজনে মিলে যেন খুব সংগোপন চক্র গড়ে তুলেছে একটা—গার্টি, রডনি আর বোমার। বোমার ছলনার আশ্রয় নিয়ে চলেছে সেটা বুঝতে পারছে সারা। ফাঁক পেলেই তিনজনে শলা-পরামর্শ আঁটে, ওকে দেখলেই থেমে যায়।

বোমারের আচরণে শুধু সারা কেন, আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম, আর ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। লোভ কখন কোন মানুষের কি সর্বনাশ করে বসে ঠিক কি। ফাঁকা পেয়ে একদিন

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হে, খুব ভাব দেখি যে আজকাল ওদের সঙ্গে ?

চোখ পিট পিট করে ও জবাব দিল, কি করি বল, এই আধ-বয়সী উপোসী শরীরটার ওপর ওই আগুনের মতো মেয়ে এসে যদি হামলা করে, না মজে যাই কোথায় ? একদিন রাতদুপুরে এসে গলা জড়িয়ে চুমু খেয়ে একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিল—কি না, ওর কেউ নেই, ওর গার্জেন হতে হবে, আমার মতো ভালো লোক আর নাকি ও দেখেনি। আমি বললাম হব, যদি না আমার ওপর আবার হামলা কর—এই বয়সে এতটা সহ্য হয় না। ও হেসে সারা—এখন কোনো কথা না শুনতে চাইলে হামলার ভয় দেখায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই হামলার খবর রডনি জানে ?

—পাগল! মেয়েটার মাথায় খুন চেপে আছে বটে, কিন্তু তেমনি ছুরির ফলার মতো বুদ্ধি।···তোমার ওপর ক্ষেপে গিয়ে ও প্রথমে রডনিকে সরিয়েছে সারার কাছ থেকে, তারপর আমাকে। এখন থেকেই ওরা সমস্ত কোম্পানীটার মালিক হয়ে বসেছে এই ভাব—অবশ্য আমিও ওদের একজন।

সফরে রওনা হবার ঠিক আগে আগে বোমার ছোট একটা চিঠি আমাকে দেখাল। তার মধ্যে যে কোন বীজ লুকিয়েছিল আমি কল্পনাও করিনি। সারা তখনো প্রেম-জ্বরে বেহুঁশ। প্রেম খোয়ানোর জ্বরে বললেই ঠিক হবে। এই সন্তাপ ছাড়া তার মাথায় দুনিয়ার আর কিছুর অস্তিত্ব নেই। এখনো সে রডনিকে ফেরানোর চিন্তায় দিশেহারা।

সারা রডনিকে চিঠি লিখেছে একটা। একবার আত্মঘাতিনী হতে গিয়ে ফল পেয়েছিল। বিভ্রান্ত অবচেতন মনে সেটাই ওকে এই চিঠি লেখার ইন্ধন জুগিয়েছিল কিনা জানি না।

'—রডনি, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। একটা শস্তা মেয়ের মোহে পড়ে তুমি প্রেমের অপমান করেছ। তুমি আমার জগৎ শূন্য করে দিয়েছ। কিন্তু আমি কোন স্তরের মেয়ে তুমি জান না। প্রেমের

অপমানে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি ফিরবে। তোমাকে ফিরতে হবে। আমি সেই অপেক্ষায় আছি। তোমাকে ক্ষমা করার অপেক্ষায় আছি। কিন্তু না যদি ফেরো, আমি কি-যে করতে পারি তুমি ভাবতেও পার না।…দুনিয়ায় এখন তোমার সব থেকে আদরের জীব কিং। তোমার চোখ খোলার জন্য সেই হিংস্র পশু আমার এই দেহ খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়বে তাই তুমি দেখতে চাও? আমাকে চেনো না, এই শেষ বারের মতো তোমাকে সাবধান করে দিলাম।'

বোমার বলল, এই চিঠি নিয়ে ওরা দুজনে খুব হাসাহাসি করছে। রডনি আর গার্টি। আমি বোমারকে বলেছি, চিঠি যেখান থেকে চুরি করেছ সেখানে রেখে এস, কেউ যেন টের না পায়।

কিং আমার হালের আমদানী। দলের সঙ্গে রেখে খেলা দেখানোর মতো পোষ মানেনি এখনো। সিংহটা যেমন তেজী তেমনি একরোখা। ওর স্বভাবের জন্য ওকে সঙ্গিনী পর্যন্ত দেওয়া হয়নি এখনো। মেরে বসার সম্ভাবনা। কর্তার কাছ থেকে শেখা বিদ্যের ফলে একমাত্র আমার কাছে ঠাণ্ডা মেরে থাকে। আর, একা আলাদা এনে ওকে নিয়ে খেলা দেখায় রডনি। সেটাকে ঠিক খেলা বলা চলে না— বেপরোয়া মানুষের সঙ্গে বেপরোয়া হিংস্র জানোয়ারের সে-এক বিচিত্র যোঝাযুঝি বলা যেতে পারে। দর্শক দম বন্ধ করে বসে থাকে।

কিংকে নিয়ে আবার রডনির সঙ্গে আমার রেষারেষি। আমি ওর নিঃসঙ্গ খাঁচায় ঢুকলে গোঁ-গোঁ করে অল্প-অল্প আদরের শব্দ করে, আমি আদর করলে ও আমার হাঁটুতে মাথা ঘষে। কিন্তু রডনিকে দেখলেই ওর শরীরের রক্ত গরম হয়। হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতলব আঁটে। আবার পারে না বলে আরো উত্তেজিত হয়। রডনিরও তাইতেই আনন্দ, তাইতেই উত্তেজনা। রডনি ঠাট্টা করে, তোমাকে ও অবলা গোছের কেউ মনে করে, আর আমাকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে।

আমি জবাব দিই, আমাকে ও বন্ধু ভাবে আর তোমাকে মনে করে অত্যাচারী প্রভু।

এর মধ্যে। খামের ভিতর হাতে-লেখা কাগজ একটা। অপরিচিত হাতের কয়েকটা আঁচড়।

পরক্ষণে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা হয়ে বসলাম। চোখের সামনে ঘর-বাড়ি সব দুলে উঠল। মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলসাতে লাগল।

চিঠিতে সময় লেখা ছিল রাত এগারোটা। কিন্তু রাত সাড়ে ন'টার মধ্যে কে যেন আমাকে ঠেলে তুলে দিল। নিজেকে আমি বিশ্বাস করি না। স্নায়ুতে স্নায়ুতে অনেকবার আগুন জ্বলে উঠেছে। অনেকবার মনে হয়েছে, ঈশ্বর আছে, ঈশ্বরের বজ্র এমনি করেই মাথায় নেমে আসুক।

কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় তা নয়।

বেরিয়ে এলাম। ক্যাম্পের অনেকটা দূরে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারকে বিদায় দিলাম। আমার হাতে জোরালো টর্চ, পকেটে রিভলভার।

শহরের প্রান্তে নিরিবিলি মাঠের মধ্যে ক্যাম্প। এরই মধ্যে চারদিক অন্ধকার। যে-লোকটা খেতে দেয় জানোয়ারগুলোকে আর তার পর্যায়ের যে দুই একজন কর্মচারী আছে—তারা এর মধ্যে মদ খেয়ে বেহুঁশ।

অন্ধকার ফুঁড়ে বোমার বেরিয়ে এলো। তার এখনো দিশেহারা বিস্ময়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিংকে খেতে দিয়েছ কিছু?

ও বলল, অল্প-স্বল্প।

—ঠিক আছে। যা বলেছি তাই কর, মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকো না।

বিস্ময়ে হাঁ হয়েই বোমার আবার অন্ধকারে মিশে গেল।

একটা ঘণ্টা দেড়টা ঘণ্টা এমন দুঃসহ দীর্ঘও হয়? প্রতিটি মিনিট অনড় পাথরের মতো এমন বুকের ওপর চেপে বসে থাকে?

…এগারোটা বেজে চার মিনিট। একটা কালো গাড়ি নিঃশব্দে কিং-এর খাঁচা ঘেঁষে দাঁড়াল। রডনি নেমে এলো। চাবি দিয়ে খাঁচার তালা খুলল। কিং গোঁ-গোঁ করে উঠল, কিন্তু বেশি শব্দ করার উপায় নেই তার। ল্যাচটা না তুলে রডনি আবার গাড়িতে ফিরে গেল। পিছনের সীট থেকে টেনে একটা ভারী কিছু পাঁজা-কোলে করে নামাল। দেহে অসুরের শক্তি তার। অনায়াসে সেই ভারী জিনিসটা তেমনি পাঁজাকোলে করে খাঁচার গায়ে এসে দাঁড়াল।

কিং! অস্ফুট একটা স্ফুলিঙ্গ বেরুলো যেন রডনি ওয়েনস্টনের গলা দিয়ে।

জবাবে কিং আরো জোরে গরগর করে সাড়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ল্যাচ উঠে গেল। খাঁচা ফাঁক করে সেই ভারী জিনিসটা, যে-জিনিসটা তার বুকের সঙ্গে আটকে থেকেও উথাল-পাথাল করতে চেষ্টা করছিল, তাকে ধুপ করে খাঁচার ভিতরে ফেলে দিয়ে চোখের নিমেষে ল্যাচ টেনে দিল।

কিং প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে উঠল এবারে।

সেই মুহূর্তে, ঠিক সেই মুহূর্তে খাঁচার ভিতর থেকে আমার বিশাল টর্চটা ঝলসে উঠল রডনির মুখের ওপর।

আমি, টনি কার্টার, খাঁচার মধ্যে বসে। আমার এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে রিভলভার। কিংকে আমি আমার দুই হাঁটুর নীচে চেপে শুইয়ে রেখে বসে আছি।

খাঁচার মধ্যে আমার সামনে মাটিতে পড়ে আছে আমার স্ত্রী সারা কার্টার। ভয়ে গাঢ় নীল-বর্ণ মুখ। অতি ত্রাসে দুচোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। জ্ঞান আছে সম্পূর্ণ। কিন্তু একটু শব্দ করার উপায় নেই। তার মুখে একরাশ কাপড় গুঁজে তারপর একেবারে ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হয়েছে। পা থেকে হাঁটুর অনেকটা ওপর পর্যন্ত শক্ত করে বাঁধা, আর হাত দুটো পিছমোড়া করে এমন বেঁধেছে যে একটু যোঝারও উপায় নেই।

রডনি চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে। টর্চের আলোয় দুচোখ ধাঁধিয়ে

.ছ। ভিতরটাও। তার মাথায় কিছু ঢুকছে না। কিন্তু টর্চ ঝলসে
'। মাত্র খাঁচার পিছন থেকে বোমার ছুটে এসেছে, সঙ্গে দুজন লোক
:তে বলেছিলাম—তারাও।

আমার ঘরে আমারই শয্যায় সারা শুয়ে আছে। জ্ঞান নেই। 'াশ্চর্য, খাঁচার মধ্যে যখন তাকে ফেলা হয়েছিল তখনো জ্ঞান ছিল, সংহটাকে দুই হাঁটুর নীচে চেপে টর্চ আর রিভলভার হাতে আমাকে ঠিকরে-পড়া চোখে দেখেছিল যখন, তখনো জ্ঞান ছিল। তার পরেই ওান হারিয়েছে।

ডাক্তার দেখে গেছে। অজ্ঞান অবস্থায় ভুল বকছিল। অব্যক্ত ত্রাসে দুই একবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পালাতে চেষ্টা করেছে। এখন ইনজেকশন দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

রডনিকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। ওকে ছাড়িয়ে আনার :কোনো রাস্তা আছে কিনা জানি না।

…বোমার একজনকে খুঁজতে বেরিয়েছে। আমি বলেছি যেখান :থেকে পারো, তাকে ধরে আনো।

খুনী মেয়ে, পাগল মেয়ে আলভাকে। কিন্তু এত রাত হয়ে গেল |বামার ফিরছে না কেন? ওকে পেল না?

…সন্ধ্যার আগে সেই চিঠি ও-ই রেখে গেছল। অথবা কাউকে দিয়ে পাঠিয়েছে। ওর মেজাজের মতোই চিঠির ভাষা। পকেট থেকে চিঠিটা বার করে পড়লাম আবার।

লিখেছে, '—টনি কার্টার, তুমি জাহান্নমে যাও। কালো মানুষ আমার শত্রু। তোমার বউকে সাবাড় করার পরেই তোমাকে আমার খুন করার কথা। তখন আর অর্ধেক কেন, গোটা প্রতিষ্ঠানটাই তো আমাদের। কিন্তু যতবার মনে হয় ষোল বছর ধরে গাধার মতো তুমি নিজের বউয়ের তপস্যায় বসে আছ—তত বারই তোমাকে সত্যি-কারের কালো মানুষ ভাবতে অসুবিধে হয়েছে আমার।…পুরস্কারের লাভ আছে? রাত ঠিক এগারোটায় তোমাদের পশুরাজ কিং-এর

আজ মহাভোজ। ইচ্ছে থাকলে তার আগে এসো। দুনিয়ার সেরা কালো মানুষ দেখতে পাবে। তুমি আর সারা কার্টার দুজনেই জাহান্নমে যাও। খবরদার, এই চিঠির কথা যেন আর দ্বিতীয় কেউ না জানে।—গার্টি আলভা।'

চিঠিটা আবার পড়তে পড়তে দুচোখে কেমন ঝাপসা দেখছিলাম। ...বোমার কি গার্টিকে পেলই না?

কিংকে উপোস করিয়ে রাখা হয়েছে শোনার সঙ্গে সঙ্গে সহজ ষড়যন্ত্রটা আমি বুঝতে পারিনি কেন? রডনিকে ফেরানোর সেই এক চিঠিতে নিজের মৃত্যুবাণ তো সারা তার হাতে সঁপেই দিয়েছিল। তাকে লিখেছিল, তার সব থেকে আদরের জীব কিং ওর দেহ খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়বে এ ও দেখতে চায় কি না। এই ভয় দেখিয়ে শেষবারের মতো সারা ওকে সাবধান করেছিল। অতএব আর বাধা কোথায়, কিং ওর দেহ সত্যিই খণ্ড খণ্ড করার পর বাঁধনের চিহ্নগুলো আর মুখের কাপড় সরিয়ে এনে চাবিটা শুধু ভিতরে রেখে এলেই কাজ শেষ। পরদিন ভালোমানুষের মতো সারার সেই চিঠিখানা বার করলেই সকলে ধরে নিত সারা যা লিখেছে তাই করেছে—রডনির আদরের জীব কিং-এর কাছে আত্মাহুতি দিয়েছে।...আর তারপর এক সময় আমাকে সরাতে পারলেই ষোল আনার মালিক।

...ঈশ্বর! তুমি কার মধ্যে কি-ভাবে কাজ করো?

...বোমার এখনো ফিরছে না কেন? চোখে আগুন মুখে আগুন বুকে আগুন সেই কালো-মানুষ খুনী মেয়েটা গেল কোথায়?

ক'দিন ধরে সারার অস্বাভাবিক চাউনি, অস্বাভাবিক মুখ। কথা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে মুখের দিকে ঘোরালো চোখে চেয়ে থাকে। আমার ষষ্ঠ চেতনা এখন আবার কাজ করছে। এই চোখ আমি চিনি। আমি দেখেছি। ওর চোখে-মুখে হত্যা নাচছে—আত্মহত্যা। বিয়ের পরে সেই এক পাহাড়ে যেমন দেখেছিলাম।

সেদিন আমারই কোন ভুলে রিভলভারটার সন্ধান পেয়ে থাকবে

ওর চোখের দিকে চেয়েই সেদিন আমার সব থেকে বেশি খটকা লেগেছিল। একটু চোখের আড়াল হতেই মনে হয়েছে কিছু অঘটন ঘটতে পারে। তক্ষুনি চুপি চুপি ফিরে এসে দেখি আমার রিভলভারটা ওর হাতে। পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছি—শক্ত হাতে ওর হাতটা তুলে ধরেছি। ওটা ছাড়িয়ে নেবার জন্য সারা পাগলের মতো ধস্তাধস্তি করেছে—আর, তখন পাগলের মতোই অন্য হাতে আমি ওকে প্রচণ্ড আঘাত করে বসেছি।

ও তিন হাত দূরে ছিটকে পড়েছে। তারপর চিৎকার করে উঠেছে, কেন এর পরেও তুমি আমাকে দয়া করবে? কেন তুমি আমাকে মরতে না দিয়ে আরো বেশী শাস্তি দেবে? কেন কেন কেন?

রিভলভারটা তালাবন্ধ করে ওর সামনে এসে দাঁড়ালাম। মাটি থেকে জোর করে ওকে বুকে করে তুলে এনে বিছানায় বসালাম। বললাম, সারা, আজ আবার আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। তাঁর শাস্তি মাথা পেতে নাও, নিজে কিছু করতে চেও না।

ও বিকৃত মুখে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল, না না। ঈশ্বর এই শাস্তি চায়, তুমি চাও না—তুমি আমাকে এর থেকেও কঠিন শাস্তি দিতে চাও। কিন্তু কেন, কেন এর পরেও তুমি আমাকে নেবে? আমি কি, তুমি জান না? আমি ব্যভিচারিণী তুমি জান না?

আমি বললাম, সারা তুমি কি ছিলে আমি কেয়ার করি না। কি হতে পার এখন এই ষোল বছর বাদে আমার চোখে শুধু সেই স্বপ্ন। তুমি প্রেমে বিশ্বাস কর, আমিও করি। আমি জানতুম না যে শুধু এই বিশ্বাসেই আমি ষোল বছর অপেক্ষা করেছি। এখন জেনেছি। এর পরেও কি এ-ভাবে নিজেকে শেষ করে তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে চাও?

ও দুহাতে মুখ ঢেকে শক্ত হয়ে বসে রইল।

—সারা! জবাব দাও। আমি যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি সেই ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমাকে যদি কথা না দাও, ষোল বছর পরেও যদি আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে না দাও, তাহলে কাল সকালের

মধ্যে তুমি দেখবে ওই রিভলভার দিয়ে তোমার আগে আমি নিজের খেলা শেষ করেছি।

সারা চমকে উঠে দাঁড়াল। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। এক নাড়ী-ছেঁড়া বিভীষিকা থেকে ছিনিয়ে আনার মতো করে দুহাতে আঁকড়ে ধরল আমাকে। তারপর বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কান্নার সমুদ্র।

...রাত্রি অনেক। আমাকে আঁকড়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে ও ঘুমোচ্ছে এখন। পাছে ওর ঘুম ভাঙে সেই ভয়ে আমি নড়তে পারছি না। দেখছি ওকে। দেখছি আর আমার চোখের কোণ দুটো সিরসির করছে কেমন।

দেখছি, আর ভাবতে ভালো লাগছে, ষোল বছরে এই প্রথম শান্তির ঘুমে বিভোর আমার বউ সারা কার্টার।